মায়া, আজটেক ও ইনকা সভ্যতা

আবদুল হালিম

অমর একুশে বাংলা একাডেমীর নিবেদন : ১৯৮৬

মায়া, আজটেক ও ইনকা সভ্যতা

আবদুল হালিম

বা ং লা এ কা ডে মী ঢা কা

ভাষা-শহীদ গ্রন্থমালা

প্রথম প্রকাশ : ৫ পৌষ ১৩৯২ ॥ ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৫

বা/এ ॥ ১৭৩২

পাণ্ডুলিপি : সংকলন উপবিভাগ

প্রকাশক : শামসুজ্জামান খান পরিচালক গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : কাইয়ুম চৌধুরী

মুদ্রক : ওবায়দুল ইসলাম ব্যবস্থাপক বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা

মূল্য : পনেরো টাকা মাত্র ॥ বিদেশে : দেড় মার্কিন ডলার

BHASHA-SHAHEED GRANTHAMALA : Series in honour of the martyrs of the Language Movement of February 1952.

MAYA AJTEK O INKA SABHYATA [Civilization of Maya Ajtek and Inka] by Abdul Halim. Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh : 5 Poush 1392 / 21 December 1985. Price : Taka 15·00 only ; Outside Bangladesh US Dollar 1·50 only.

Tribute in February 1986 to the Martyrs of February 1952

উৎসর্গ

স্নেহের দিশা, কলি, তাতা, অসীম,
সুমন, অজয়, ইরা, শাশা,
অনিন, কমল ও চিত্রাকে

প্রসঙ্গ-কথা

বাহান্নোর ভাষা-শহীদেরা মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর দেখতে চেয়েছিলেন, সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রে তার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। জ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় অবাধ বিচরণ আজো স্বপ্ন। এ স্বপ্নকে খানিক-টুকু হলেও সত্য ক'রে তোলার এক বিনীত চেষ্টা থেকে এ গ্রন্থমালা।

বাংলা একাডেমী সকলের একাডেমী। সবারই দাবি এর উপর। এ গ্রন্থমালার বই তাই সবার জন্যে। কেবল বিশেষজ্ঞের জন্যে নয়, কেবল শিক্ষার্থীর জন্যে নয়। নানা বিষয় নিয়ে এ গ্রন্থমালা — জ্ঞানের সব দিগন্তই যেন একদিন ছুঁতে পারি, এই আমাদের প্রার্থনা। যাঁরা লিখেছেন তাঁদের অনেকেই এই প্রথম বারের মতো লিখলেন কিংবা এই প্রথম বারের মতো বাংলায় লিখলেন। আমাদের চিন্তার ভুবনে নতুন কণ্ঠ বড়ো প্রয়োজন।

প্রাচীন আমেরিকায় গড়ে উঠেছিলো বিচিত্র সভ্যতা। আজ তার চিহ্ন নেই, কিন্তু তার উত্তরাধিকার পৃথিবী বয়ে চলেছে। বিলুপ্ত সে-সভ্যতার পরিচয় তুলে ধরবে এ বই।

এ গ্রন্থমালার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মী ও অন্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

ভাষা-শহীদদের বারবার শ্রদ্ধা জানাই।

মনজুরে মওলা
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

প্রাচীন আমেরিকার সভ্যতা ও সংস্কৃতি: মায়া, আজটেক, ইনকা ও অন্যান্য সভ্যতা

ক্রিস্টফার কলম্বাস যখন পনেরো শতকের শেষভাগে, ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে, ইউরোপ থেকে আমেরিকা যাওয়ার জলপথ আবিষ্কার করেন, তারপরে ষোল শতকে দলে দলে স্পেনীয়রা সোনা রূপা ও ধনরত্নের লোভে আমেরিকা মহাদেশে যেতে শুরু করে। স্পেনীয়রা ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য-মেক্সিকো অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছলে সেখানে অনেক সমৃদ্ধ নগর ও রাজ্যের সন্ধান পায়। এ নগরগুলো ছিলো আজটেক সাম্রাজ্যের অধীনে। এ নগরগুলোতে স্পেনীয়রা দালান-কোঠা, বড় বড় প্রাসাদ, পিরামিড, মন্দির, রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার প্রভৃতি দেখতে পায়। এরপরে স্পেনীয় সৈন্যদল যখন গুয়াতেমালা এবং পূর্ব-মেক্সিকো অঞ্চলে যায় তখন সেখানে আজটেক সভ্যতার চেয়েও প্রাচীন এক সভ্যতার সাক্ষাৎ পায়। এ উন্নত সভ্যতার নাম ছিলো মায়া সভ্যতা। মায়া অঞ্চলেও স্পেনীয়রা পাথরের বাড়ি-ঘর, প্রাসাদ, পিরামিড, মন্দির, পথ-ঘাট, হাট-বাজার সমন্বিত অনেক নগরের সাক্ষাৎ পেয়েছিলো।

স্পেনীয় ভাগ্যান্বেষীরা এরপর দক্ষিণ-আমেরিকায় যায় এবং সেখানে পেরু অঞ্চলে আন্দিজ পর্বতের উপরে ইনকা সাম্রাজ্যের সন্ধান লাভ করে। এরপরে স্পেনীয় এবং অন্যান্য ইউরোপীয়রা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতে ধনসম্পদের লোভে আরো অনেককাল নতুন

নতুন রাজ্যের সন্ধান করেছে কিন্তু নতুন কোনো রাজ্য বা নগর সভ্যতার সন্ধান তারা পায় নি। শুধু মেক্সিকো-গুয়াতেমালা অঞ্চলে এবং ইকুয়েডর-পেরু-বলিভিয়া অঞ্চলেই উন্নত সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিলো। উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকার বাকি অংশে ছিলো শিকারী মানুষ অথবা সামান্য কিছু কৃষিজীবী মানুষ।

ক্রমে ক্রমে প্রাচীন আমেরিকার সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাসের সামগ্রিক চিত্রটা পাওয়া গেছে। জানা গেছে, আজ থেকে ৩০ বা ৪০ হাজার বছর আগে শিকারী যুগের পশু শিকারী মানুষ বেরিং প্রণালী পার হয়ে এশিয়া থেকে উত্তর-আমেরিকার আলাস্কা অঞ্চলে গিয়েছিলো। তখন পৃথিবীতে বরফ যুগ চলছিলো বলে বেরিং প্রণালী ছিলো বরফে ঢাকা, তাই এ পথে আমেরিকা যেতে শিকারী মানুষের কোনো অসুবিধা হয় নি। উত্তর আমেরিকার আলাস্কা থেকে শিকারী মানুষেরা উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলো। এ মানুষেরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত শিকারী সমাজের স্তরেই রয়ে গিয়েছিলো।

কলম্বাস যখন আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছে ছিলেন তখন যদি সারা আমেরিকাতে শুধু আদিবাসী শিকারী রেড ইণ্ডিয়ানরাই থাকতো তাতে অবাক হওয়ার কিছু ছিলো না। কিন্তু দেখা গেলো, উত্তর আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল থেকে শুরু করে দক্ষিণ-আমেরিকার পেরু অঞ্চল পর্যন্ত এলাকার মানুষেরা কৃষিকাজ জানে। আরও দেখা গেলো মেক্সিকো এবং পেরু অঞ্চলে মায়া, আজটেক, ইনকা প্রভৃতি উন্নত সভ্যতারও আবির্ভাব ঘটেছিলো। এর ফলে পণ্ডিতদের মধ্যে কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন যে মায়া, আজটেক, ইনকা সভ্যতার সাথে প্রাচীন মিশর, ব্যবিলন ও আসিরিয়ার সভ্যতার মিল আছে, সুতরাং পুরনো পৃথিবী এ সকল প্রাচীন সভ্যতার প্রভাবেই আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো। অন্য একদল

পণ্ডিত বলেন যে প্রাচীন আমেরিকাতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে ও নিজস্ব পদ্ধতিতে নগর সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিলো। এ বিতর্কের মীমাংসা এখন পর্যন্ত হয় নি।

প্রাচীন আমেরিকাতে উন্নত সভ্যতা বলতে যে শুধুমাত্র মায়া, আজটেক ও ইনকা সভ্যতাই গড়ে উঠেছিলো তা নয়। বস্তুত পূর্ববর্তী অন্যান্য সভ্যতার ভিত্তির উপরেই এ তিনটি সভ্যতার উদয় ঘটেছিলো। যেমন, ভেরাক্রুজ-এর দক্ষিণের অঞ্চলে মায়াদের আগে ওলামক সভ্যতার উদয় ঘটেছিলো। মধ্য মেক্সিকোতে আজটেক অঞ্চলে আজটেকদের আগে টোলটেক সভ্যতা এবং তারও আগে টেওটি হুয়াকান-এর সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো। দক্ষিণ-আমেরিকায় আন্দিজ পর্বত অঞ্চলে ইনকাদের আগে চিমু সাম্রাজ্য এবং তার আগে টিয়াহুয়ানাকো, চাভিন ও অন্যান্য সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিলো। পরবর্তী পৃষ্ঠার তালিকায় এ সকল সভ্যতার কালপঞ্জি দেয়া হলো। তবে এগুলোর মধ্যে একটা সভ্যতার প্রভাব অন্য একটা সভ্যতার উপর পড়েছিলো কি না বা কতখানি পড়েছিলো তার ইতিহাস এখনও সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয় নি।

প্রাচীন আমেরিকার বিভিন্ন সভ্যতার কালপঞ্জি

		অঞ্চল	সভ্যতার নাম	ব্যাপ্তিকাল
মধ্য আমেরিকা বা মেসো-আমেরিকার সভ্যতা	(ক) ওলমেক-মায়া অঞ্চল	১. পূর্ব মেক্সিকো : ভেরাক্রুজ-এর দক্ষিণ	ওলমেক সভ্যতা	আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ থেকে খ্রীষ্টীয় ৪০০ অব্দ
		২. পূর্ব মেক্সিকোর ইউকাতান উপদ্বীপ ; গুয়াতেমালা ; বেলিজ ; এল সালভাদর ও হণ্ডুরাস-এর একাংশ।	মায়া সভ্যতা	আনুমানিক ৩০০ থেকে ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দ
	(খ) আজটেক অঞ্চল	১. মধ্য মেক্সিকোর টেওটিহু-য়াকান	টেওটিহুয়াকান সভ্যতা	আঃ ৩০০ থেকে৯০০ খ্রীষ্টাব্দ
		২. মধ্য মেক্সিকোর টোলান	টোলটেক সভ্যতা	আঃ ৯০০ থেকে ১১০০ বা ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ
		৩. মধ্য মেক্সিকো অঞ্চল	আজটেক সভ্যতা	আঃ ১৪০০ থেকে ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দ
আন্দিজ পর্বত অঞ্চলের (এ্যাণ্ডিয়ান) সভ্যতা		১. পেরু অঞ্চল	চাভিন সংস্কৃতি	আঃ ৮৫০ খ্রীষ্ট পর্বাব্দ থেকে ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ
		২. টিয়াহুয়ানাকো (বলিভি-য়াতে, টিটিকাকা হ্রদের ১৩ মাইল দক্ষিণ পূর্বে)	টিয়াহুয়ানাকো সংস্কৃতি	আঃ ২০০ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ বা মতান্তরে ৮০০-১০০০ খ্রীঃ
		৩. উত্তর পেরু	চিমু সাম্রাজ্য	আঃ ১২০০—১৪৩৮ খ্রীঃ
		৪. ইকুয়েডর-পেরু-বলিভিয়া	ইনকা সাম্রাজ্য	১৪৩৮—১৫৩৩ খ্রীঃ

প্রাচীন আমেরিকার কয়েকটি উন্নত সভ্যতার বিবরণ বর্তমান গ্রন্থটির আলোচনার বিষয় রূপে লেখা হয়েছে। স্পেনীয়রা যখন ষোল শতকে নতুন পৃথিবী তথা আমেরিকা মহাদেশে উপনিবেশ বিস্তারের চেষ্টা করে তখন তারা সেখানে মায়া, আজটেক ও ইনকা সভ্যতাকে জীবন্ত সভ্যতা হিসেবে দেখতে পেয়েছিলো। এ কারণে এ তিনটি সভ্যতা সারা পৃথিবীর লোকের কাছে পরিচিত হয়েছে। আমাদের দেশের মানুষের মধ্যেও মায়া, আজটেক ও ইনকা সভ্যতা সম্পর্কে গভীর আগ্রহ রয়েছে। এ তিনটি সভ্যতার ইতিহাস ও সামগ্রিক পরিচয় সংক্ষেপে এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হলো।

মায়া সভ্যতার ইতিহাস

মায়া সভ্যতার উৎপত্তির ইতিহাস খুবই অস্পষ্ট এবং প্রায় অজানা। তবে পণ্ডিতরা এ বিষয়ে একমত যে উত্তর আমেরিকা মহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বহু শতাব্দী আগেই মায়ারা নতুন পাথর যুগের সভ্যতা আয়ত্ত করেছিলো। মায়া বিশেষজ্ঞদের মতে, খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে মায়ারা কৃষি কাজ, মাটির পাত্র নির্মাণ প্রভৃতি আয়ত্ত করেছিলো। মায়া সভ্যতার মোটামুটি ইতিহাস জানা যায় ৩১৭ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে। এ সময়ের পরবর্তী ইতিহাসকে দুটো অংশে ভাগ করা চলে: মায়া সভ্যতার প্রথম স্তর (৩১৭—৯৮৭ খ্রী:) এবং মায়া সভ্যতার শেষ স্তর (৯৮৭—১৬৯৭ খ্রী:)।

৩১৭ খ্রীষ্টাব্দের দিকে মায়া সভ্যতার প্রথম সূত্রপাত ঘটেছিলো সম্ভবত বর্তমান গুয়াতেমালার অন্তর্গত পিটেন অঞ্চলের নিম্নভূমিতে। মায়ারা যখন এখানে প্রথম আসে তখন এ অঞ্চলে এত গভীর বন ছিলো যে মায়া কৃষকদের বারবার গাছ কেটে আর গাছ পুড়িয়ে বন পরিষ্কার করতে হয়েছিলো। এ ভাবে কঠোর পরিশ্রম করে মায়ারা এ অঞ্চলে বন কেটে বসতি স্থাপন করে ও জমি আবাদ করে। মায়ারা ভূট্টা, সীম, লাউ, মিষ্টি আলু, টমাটো, কাসাভা প্রভৃতির চাষ করতো।

মায়া সভ্যতার প্রথম স্তরে টিকল, কোপান, পালেঙ্ক্ প্রভৃতি শহরকে কেন্দ্র করে মায়া সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো। এ আমলের মায়া সভ্যতার

কেন্দ্রগুলো প্রধানত গুয়াতেমালাতেই অবস্থিত ছিলো। পালেঙ্ক্ শহরটি অবশ্য ছিলো মেক্সিকোতে। আর কোপান শহরটি ছিলো বর্তমান হণ্ডুরাস দেশে। তবে তখন এ পাশাপাশি দেশগুলো একই অঞ্চলের অন্তর্গত বলে গণ্য হতো।

প্রথম পর্যায়ের মায়া সভ্যতায় সভ্যতা-সংস্কৃতির গভীর উৎকর্ষের প্রকাশ ঘটালেও, ৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দের দিকে এ সভ্যতার অবনতি ঘটে। কোনো অজানা কারণে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা সবগুলো শহরকে অকস্মাৎ পরিত্যাগ করে। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে, দীর্ঘকাল এক স্থানে চাষ করার ফলে জমি ক্রমশ নিষ্ফলা হয়ে পড়েছিলো, তখন বাধ্য হয়ে মায়ারা অনেক দূরে নতুন ও অনবাদী জমিতে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেছিলো। এরপর মায়া সভ্যতার কেন্দ্রভূমি স্থানান্তরিত হয় আরও উত্তরের ইউকাতান উপদ্বীপে। এভাবে দশম শতাব্দীতে গুয়াতেমালা অঞ্চলে গড়ে ওঠা মায়া সভ্যতার প্রথম পর্যয়ের অবসান ঘটে।

মায়া সভ্যতার দ্বিতীয় বা শেষ পর্যায়ে বর্তমান মেক্সিকোর পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ইউকাতান উপদ্বীপে নতুনভাবে মায়া সভ্যতার পুর্নজন্ম ঘটে। ইউকাতান উপদ্বীপটি ছিলো গুয়াতেমালা থেকে উত্তর দিকে। মায়া সভ্যতার প্রথম পর্যায়ে এ অঞ্চল মায়া সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলো কিন্তু তখন এখানে মায়া সভ্যতার কোনো উন্নত প্রকাশ ঘটে নি।

দশম শতকে গুয়াতেমালা অঞ্চলের মায়া অধিবাসীরা কোনো অজ্ঞাত কারণে ইউকাতান অঞ্চলে চলে যায়। তখন সেখানে মায়া সভ্যতার দ্বিতীয় পর্যায়ের উদয় ঘটে। এ পর্যায়ে ইউকাতান অঞ্চলে চিচেন ইটজা, মায়াপান, উক্সমাল প্রভৃতি নগরকে কেন্দ্র করে মায়া সভ্যতার বিকাশ ঘটে। দ্বিতীয় পর্যায়ের মায়া সভ্যতা ৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিলো। তবে এ পর্যায়ের মায়া সভ্যতার বিকাশের ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির ইতিহাস নয়।

ইউকাতান অঞ্চলের মায়া নগরগুলোর মধ্যে বহু শত বছর ধরে রক্ত-ক্ষয়ী যুদ্ধ চলেছিলো। পনেরো শতক থেকে ইউকাতান অঞ্চলের মায়া সভ্যতায় অবক্ষয় ও পতনের লক্ষণ ফুটে উঠতে থাকে। এক পর্যায়ে মায়াদের আভ্যন্তরীণ কলহ ও যুদ্ধের পরিণতিতে মায়াপান শহরটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মায়া সভ্যতা ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিলো।

কর্টেজের নেতৃত্বে স্পেনীয় সৈন্যরা যখন ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে মেক্সিকোর আজটেক সাম্রাজ্যকে আক্রমণ করে তখনও স্পেনীয়রা মায়াদের রাজ্য সম্পর্কে কোনো খোঁজ খবর পায় নি। ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনীয়রা আজটেকদের পরাজিত করে মেক্সিকোর অধিপতি হয়। এরপর স্পেনীয়রা মধ্য মেক্সিকো থেকে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে মায়াদের রাজ্য আক্রমণ করে। আবার পানামার অন্য একদল স্পেনীয় সৈন্যও মায়াদের রাজ্য আক্রমণ করতে এগিয়ে যায়। স্পেনীয়রা মায়াদের রাজ্য প্রথম আক্রমণ করে ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। মায়াদের সাথে স্পেনীয়দের লড়াই দীর্ঘদিন ধরে চলেছিলো। অনেক শহরের মায়ারাই দুর্গম অরণ্যে আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনীয়রা মায়াদের রাজ্য পুরোপুরি দখল করতে সক্ষম হয়। এভাবে ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মায়া সভ্যতা চিরকালের মতো ধ্বংস হয়ে যায়।

মায়া শিল্পকলা

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে মায়ারা পরম উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছে। মায়াদের মন্দির, প্রাসাদ, পিরামিড প্রভৃতি নির্মিত হতো এক একটা চত্বরকে ঘিরে। মায়ারা যে পিরামিড তৈরি করতো তা মিশরের যেসব পিরামিডের সাথে আমরা পরিচিত তার থেকে অন্য রকম ছিলো। মায়াদের পিরা-মিড ছিলো ধাপ-পিরামিড। প্রথমে মাটি বা পাথর ফেলে ফেলে উচুঁ

চৌকোনা ঢিবি বা পাহাড় তৈরি করা হতো। তাতে চারপাশ দিয়ে ধাপ কেটে কেটে ঢিবিটাকে ক্রমশ উপরের দিকে ছোট করে আনা হতো। তখন দেখলে মনে হতো যে একটা মাথা কাটা পিরামিডের উপর তার চেয়ে ছোট আরেকটা মাথা কাটা পিরামিড বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার উপর আরেকটা, তার উপর আরেকটা। এভাবে একটা ধাপ পিরামিড তৈরি করা হতো যার উপর ভাগে থাকতো একটা চৌকোনা সমতল ভূমি। এ সমতল স্থানটার উপর একটা মন্দির তৈরি করা হতো। মন্দিরে ওঠার জন্য পিরামিডের গায়ে একটা সিঁড়ি নির্মাণ করা হতো। সমস্ত পিরামিডটিকে পাথরের ইটের আস্তরণ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হতো। এভাবে ধাপ-পিরামিড তৈরি করা হতো। মায়াদের ধাপ-পিরামিডের মাথায় থাকতো একটা মন্দির। এ ধাপ-পিরামিডগুলোর সাথে প্রাচীন ব্যবিলনিয়ার ডিগেগুরাট-মন্দিরের মিল আছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রাচীন মিশরেও প্রথম দিকে ধাপ-পিরামিড তৈরি করা হতো। প্রাচীন মিশরে শেষ পর্যায়ে জ্যামিতিক আকৃতির মসৃণ ও শীর্ষবিন্দু বিশিষ্ট পিরামিড তৈরি করা হতো। তবে মিশরে প্রথম পর্যায়ে নির্মিত ধাপ-পিরামিডের উপর অবশ্য কোনো মন্দির নির্মিত হতো না।

মায়া আমলের ভাস্কর ও স্থপতিরা সাধারণত কাঠ ও পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করতেন। মায়ারা কোনো রকম ধাতুর হাতিয়ার ব্যবহার করতো না বলেই পণ্ডিতরা মনে করেন, কারণ মায়াদের কোনো শহরেই কোনো রকম ধাতুর হাতিয়ারের সন্ধান পাওয়া যায় নি। মায়াদের রাজ্যে চুনাপাথর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতো। চুনাপাথর পুড়িয়ে মায়ারা চুন তৈরি করতো; এ চুনের সাথে পাথরের কুচি মিশিয়ে এক ধরনের সুরকি বা মশলা তৈরি করতো। পাথরের নুড়ির সাথে এ মশলা মিশিয়ে তা দিয়ে মায়ারা মজবুত দালান কোঠা তৈরি করতো। এসব

দালান কোঠার দেওয়ালে তারা অবশ্য পাথরের ইটের আস্তরণ দিতো। মায়ারা দোতালা ও তিনতালা দালান তৈরি করতে পারতো।

মায়াদের ভাস্কর্য প্রধানত তাদের স্থাপত্যকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠছিলো। মন্দির ও পিরামিডের গায়ে ও ধাপগুলোকে অলংকৃত করার জন্য নানা রকম মূর্তি ও ছবি খোদাই করা হতো। মায়াদের শিল্পচর্চা প্রধানত ধর্মকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিলো। মন্দির পিরামিড, প্রাসাদ প্রভৃতির অলংকরণের জন্য মায়ারা দেবদেবীর মূর্তি বা দেবদেবীর সাথে সম্পর্কিত জীবজন্তু ও প্রাণীর মূর্তি নির্মাণ ও খোদাই করতো। ব্যাঙ, সাপ, জাগুয়ার এবং পাখি ছিলো দেবদেবতার সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রাণী। চিচেন ইটজা প্রভৃতি নগরে এসকল প্রাণী ও দেবদেবীর মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। মায়ারা সুন্দর ছবি আঁকতে পারতো। তবে মায়াদের আঁকা কোনো দেওয়াল চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় নি। তবে মায়ারা মূর্তি ও দেওয়ালের গায়ে সুন্দরভাবে রঙের প্রলেপ দিতে পারতো। মায়াদের বই বা পাণ্ডুলিপিতে অবশ্য ছবি থাকতো।

মায়ারা চারকোণা পাথরের স্তম্ভ ও ফলকের উপরে নানা রকম বিবরণ ও সন তারিখ খোদাই করে রাখতো। এসকল শিলালিপি ও পাথরের স্তম্ভ ৩ ফুট থেকে ২৭ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতো।

মায়ারা সুন্দর ডিজাইনের কাপড় বুনতে পারতো, জেড পাথরের মূর্তি তৈরি করতো, মাটির চিত্রিত পাত্র তৈরি করতো এবং সোনা ও রূপার সুন্দর সুন্দর অলংকার তৈরি করতে পারতো।

মায়াদের রাষ্ট্র ও সমাজ

মায়াদের সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো অনেকগুলো স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নগর রাষ্ট্রকে ভিত্তি করে। এক একটা নগর-রাষ্ট্রে ২৫,০০০ বা তার চেয়ে

বেশি সংখ্যক লোক থাকতো। মায়াদের সমাজে সামাজিক শ্রেণীবিভাগ বিদ্যমান ছিলো। সবচেয়ে উঁচু শ্রেণীতে ছিলো অভিজাত ও পুরোহিত শ্রেণীর স্থান। তাঁদের নীচে ছিলো কৃষক, কারিগর ও ব্যবসায়ীদের স্থান। এদের নীচে ছিলো দরিদ্র ও সম্পত্তিহীন স্বাধীন মানুষের স্থান। সমাজের সবচেয়ে নীচে ছিলো দাস শ্রেণীর স্থান। মায়াদের রাজ্যের সবচেয়ে কঠোর পরিশ্রমের কাজ দাসদেরই করতে হতো।

মায়াদের প্রত্যেক নগর-রাষ্ট্রে একজন করে শাসক বা রাজা থাকতেন। সামাজিক, ধর্মীয় ও যুদ্ধের ব্যাপারে রাজাই ছিলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। নগর রাষ্ট্রের অধীনস্থ গ্রাম ও ছোট ছোট নগরের জন্য গ্রাম-প্রধান বা নগর-প্রধান প্রভৃতিকে নিয়োগ করতেন ঐ নগর-রাষ্ট্রের রাজা। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য রাজা একটা পরামর্শ সভা বা উপদেষ্টা-পরিষদ গঠন করতেন। গ্রাম-প্রধানগণ, পুরোহিতগণ ও বিশিষ্ট পরামর্শদাতারা এ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হতেন। রাষ্ট্রের শাসন-কাজ পরিচালনার জন্য রাজা নানা পর্যায়ে শাসক ও প্রশাসক নিয়োগ করতেন। রাজার আত্মীয়স্বজনদের মধ্য থেকেই এ সকল শাসক-প্রশাসকদের নির্বাচন করা হতো। রাজা ও বিভিন্ন পর্যায়ের শাসক-প্রশাসকদের নিয়েই রাজ্যের অভিজাত শ্রেণী গঠিত হয়। রাজা মারা গেলে বা সিংহাসন ত্যাগ করলে তাঁর ছেলে রাজা হতেন। পুরোহিতদের মধ্যেও কাজের গুরুত্ব অনুসারে শ্রেণী বিভাগের প্রচলন ছিলো। সমাজে পুরোহিতদের স্থান ছিলো অভিজাত শ্রেণীর সমান স্তরে বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদেরও উপরে।

মায়া অর্থনীতি

কৃষি কাজ ছিলো মায়া অর্থনীতির ভিত্তি। মায়ারা বন পুড়িয়ে আর গাছ কেটে বন পরিষ্কার করতো, তার পর সে জমিতে চাষাবাদ

করতো। মায়ারা লাঙল বা এ জাতীয় কোনো চাষের যন্ত্র ব্যবহার করতো না। তারা প্রধানত কাঠের শাবল দিয়ে মাটিতে গর্ত করে তাতে বীজ রোপন করতো। তবে মায়ারা পানি সেচের কৌশল জানতো। মায়ারা ভূট্টা, লাউ, সীম, মিষ্টি আলু, টমাটো, কাসাভা, মরিচ, নানা রকম ফল প্রভৃতির চাষ করতো। তারা তুলা এবং কোশের চাষও করতো। মায়ারা মৌমাছির চাষ করতো এবং মৌচাক থেকে মধু ও মোম সংগ্রহ করতো। মায়ারা টার্কি নামক এক জাতীয় মুর্গী পুষতো ও তার মাংস খেতো।

মায়াদের সমাজে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিলো। বড় বড় শহর গুলোতে নির্দিষ্ট দিন অন্তর হাট বা মেলা বসতো। ব্যবসায়ীরা হাঁটা পথেও মালপত্র নিয়ে আসতো, জলপথেও আনতো। নদী পথে যাওয়ার সময়ে বণিকরা বড় বড় নৌকায় মাল ভর্তি করে নিয়ে যেতো। মায়া কারিগররা পাথরের অস্ত্র, কাঠ, হাড় পাথরের জিনিসপত্র ও পালকের টুপি প্রভৃতি তৈরি করতো। মায়ারা টাকা কড়ি বা ধাতুর মুদ্রা ব্যবহার করতো না। তারা কোকো ফলের দানাকে মুদ্রা বা টাকা হিসাবে ব্যবহার করতো।

মায়ারা ধাতুবিদ্যা আয়ত্ত করতে পারে নি। এর অর্থ হলো তারা আকর গলিয়ে ধাতু নিষ্কাষণ করতে পারতো না বা ধাতুকে গলিয়ে ছাঁচে ঢালাই করতে পারতো না। তবে, আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, কোনোক্রমে তামা বা সোনা পেলে তারা তা দিয়ে গয়না বা ছোট ছোট ঘণ্টা তৈরি করতে পারতো। এ রকম সোনা বা তামা পাওয়া যায় পাহাড় ও মৃত আগ্নেয়গিরির গায়ের ভিতরের সোনা বা তামার শিরা থেকে। মায়ারা এ রকম তামা বা সোনার টুকরোকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে নির্দিষ্ট আকৃতির গয়না বা ঘণ্টা প্রভৃতি তৈরি করতে পারতো। মায়ারা অস্ত্র বা পাত্র প্রভৃতি তৈরি করতো পাথর কেটে। মায়াদের অঞ্চলে অব্‌সিডিয়ান পাথর পাওয়া যেতো। অবসিডি-

য়ান হচ্ছে এক ধরনের প্রাকৃতিক কাঁচ। এ পাথরটা যেমন শক্ত, তেমনি ধারালোও হতে পারে। অবসিডিয়ান দিয়ে মায়ারা অস্ত্র এবং নানা ধরনের পাত্র এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করতো।

মায়াদের ধর্ম

মায়ারা সূর্যের পূজা করতো। পিরামিডের মাথায় মায়াদের যে মন্দির থাকতো সেখানে সব সময় একটা পাথরের বেদী থাকতো। এ বেদীর উপরে সূর্য দেবতার উদ্দেশ্যে মানুষকে বলি দেওয়া হতো। সূর্য ছাড়াও মায়ারা আরো অনেক দেবতার পূজা করতো। ধর্ম ছিলো মায়াদের সমগ্র জীবন যাত্রার এক অবিচ্ছেদ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। মায়াদের ধর্ম চেতনা তাদের সমগ্র সামাজিক ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করতো। মায়াদের রাষ্ট্রব্যবস্থাও পুরোহিত-তন্ত্র ও ধর্মতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। মায়াদের সমাজে একমাত্র পুরোহিতরাই হায়ারোগ্লিফিক ধরনের অক্ষর লিখতে ও পড়তে পারতো। তাই মন্দিরের বা প্রাসাদের দেওয়ালে ও সামনের অংশে এবং শিলালিপিতে খোদাই করে লেখার কাজটা পুরোহিতরাই করতো। সমগ্র রাষ্ট্রীয় ভবন, পিরামিড, মানমন্দির প্রভৃতি নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্ব ও অধিকার ছিলো পুরোহিতদের হাতে। তাই মায়াদের সমগ্র জীবন ধারার উপর পুরোহিতদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিলো।

মায়াদের রাজ্যে এক ধরনের বল খেলার প্রচলন ছিলো। বল খেলা হতো পাথর দিয়ে বাধানো একটা চত্বরে। চত্বরের চারদিক উচুঁ দেওয়াল দিয়ে ঘেরা থাকতো। বলটা তৈরি হতো জমাট রবার দিয়ে; এর ব্যাস ছিলো প্রায় ৬ ইঞ্চি। খেলোয়াড়রা হাত দিয়ে বল ধরতে পারতো না, কেবল পাছা দিয়ে বা কনুই দিয়ে বলটিকে আঘাত করা যেতো। জমাট রবারের বল অবশ্য মাটিতে পড়লে সহজেই লাফিয়ে উঠতো। তবে

কখনও যদি বলটা 'নিষ্প্রাণ' হয়ে মাটিতে পড়ে যেতো বা পরে থাকতো, তাহলে যাদের দোষে বলটা 'মরে' যেতো সে দলের খেলোয়াড়দেরও দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হতো। খেলা ঠিকমত পরিচালিত হলেও অবশ্য এ উপলক্ষে এক বা একাধিক মানুষকে বলি দেওয়া হতো।

এ বল খেলা ছিলো মায়াদের সমাজে এক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান। দেওয়ালের উপরে নির্মিত প্রশস্ত আসনে বসে অভিজাত মায়ারা এ খেলা দেখতেন। সাধারণ নাগরিকরা নীচে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতেন। এ বল খেলা ক্রমশ মেক্সিকো অঞ্চলে ও পরবর্তীকালে আজটেকদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছিলো। কোনো কোনো স্থানে দেওয়ালের গায়ে পাথরের গোলাকার চক্র বসানো থাকতো, যার মধ্য দিয়ে বলটাকে ফেললে খেলায় জিত হতো।

মায়াদের জ্ঞানবিজ্ঞান

মায়াদের ধর্মীয় উৎসব পালনের জন্য এবং কৃষি কাজের প্রয়োজনে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা এবং সময় নিরূপণের বিষয়ে তারা খুবই মনোযোগী ছিলো। তারা চাঁদ, সূর্য ও নক্ষত্রকে পর্যবেক্ষণ করে জ্যোতির্বিদ্যায় খুবই পারদর্শিতা অর্জন করেছিলো। মায়ারা তাদের জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান প্রয়োগ করে একটা বার্ষিক পঞ্জিকা বা ক্যালেণ্ডার আবিষ্কার করেছিলো। মায়ারা দু রকম বছরের হিসাবে রাখতো। একটা ছিলো পবিত্র বছর— এটা ছিলো ২৬০ দিনের। আরেকটা ছিলো সাধারণ হিসাবের বছর—এতে ৩৬০ দিনে বছর গণনা করা হতো এবং তার সাথে ৫টা অপয়া দিন যোগ করা হতো। অর্থাৎ সাধারণ হিসাবের বছর ছিলো ৩৬৫ দিনে। তাই বলা চলে মায়াদের ৩৬৫ দিনের সৌর বছরের হিসাব প্রায় নিখুঁত ছিলো। একটু হিসাব করলেই দেখা যাবে সাধারণ বছরের হিসেবে ৫২ বছরে যতদিন হয়, পবিত্র

বছরের হিসেবে ৭৩ বছরে ততদিন হয় (কারণ, ৫২×৩৬৫ = ১৮৯৮০ দিন এবং ২৬০×৭৩ = ১৮৯৮০ দিন)। তাই মায়াদের গণনায় প্রতি ৫২ বছর অন্তর দুই ধরনের বছরের হিসাবে একই দিনে নববর্ষের শুরু হতো। এ দিনটিকে মায়ারা বিশেষ মর্যাদার সাথে উদযাপন করতো। মায়াদের গণনায় তাই ৫২ বছরের একটা কালচক্র ছিলো।

মায়ারা লেখন পদ্ধতি এবং সংখ্যা লেখার পদ্ধতি জানতো। মায়া সভ্যতার প্রথম পর্যায়ে তারা শুধু পাথরের ফলকে ও মাটির পাত্রে খোদাই করে লিখতো। মায়া সভ্যতার শেষ পর্যায়ে তারা হাতে লেখা বইয়ে তাদের কথা লিখে রাখতো। মায়ারা চিত্রলিপি ও প্রতীকধর্মী লিপিতে লিখতো। প্রাচীন মিশরীয়রা যেমন এক এক রকম ছবি দিয়ে এক এক রকম শব্দ বা কথা বোঝাতো, মায়ারাও তেমনি এক একটি ছবি বা প্রতীক দিয়ে এক এক রকম শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বোঝাতো। অবশ্য মিশরীয়দের চিত্রলিপি আর মায়াদের চিত্রলিপি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। মায়াদের লেখা বা চিত্রলিপির অর্থ এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা যায় নি।

স্পেনীয়রা যখন মেক্সিকো এবং গুয়াতেমালা অঞ্চল অধিকার করে তখন মায়া অঞ্চলের নগরগুলোতে অজস্র হাতে লেখা বই ছিলো। মায়া পুরোহিতরা এ সব বই লিখেছিলেন। স্পেনীয় পাদ্রীরা এ সব বইকে 'শয়তানের কাণ্ড' আখ্যা দিয়ে পুড়িয়ে ফেলেন। মাত্র তিনটি বা চারটি বই কোনো ক্রমে রক্ষা পেয়েছিলো। এ বইগুলো এখন ড্রেসডেন, প্যারিস এবং মাদ্রিদে আছে, কিন্তু এগুলো কেউ এখন পড়তে পারেন না। প্রথম দিকে ইউকাতান অঞ্চলে কয়েকজন স্পেনীয় পাদ্রী কষ্ট করে মায়া ভাষায় লেখা বই পড়তে শিখেছিলেন। কিন্তু তারপর এ বিদ্যা লোপ পেয়ে গেছে। এখন আর মায়ারা বা ইরোপীয়রা কেউই সে ভাষা পড়তে পারেন না। তবে স্পেনীয় অধিকারের প্রথম

অবস্থায় অর্থাৎ ষোল সতেরো শতকে মায়া শিলালিপির কতগুলো লেখা মায়া পুরোহিতদের সহায়তায় স্পেনীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিলো। তা থেকে মায়াদের সভ্যতা ও ইতিহাস সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেছে। তবে, মায়াদের ধর্ম, বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসা-বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ক সব বই-ই ধ্বংস হয়ে গেছে।

মায়ারা এক ধরনের সংখ্যা লেখার পদ্ধতি জানতো। মায়ারা শূন্য সংখ্যার ব্যবহার জানতো। স্থানীক অংক পাতন পদ্ধতির জ্ঞানও তাদের ছিলো। অর্থাৎ আমরা যেমন ১১১ লিখলে ডানদিক থেকে প্রথম ১ দিয়ে ১, দ্বিতীয় ১ দিয়ে ১০ এবং তৃতীয় ১ দিয়ে ১০০ বুঝাই, মায়ারাও অনেকটা এ ধরনের সংখ্যা পাতন পদ্ধতি ব্যবহার করেতা। তবে আমাদের অংক লেখার ভিত্তি যেমন ১০, মায়াদের সংখ্যা লেখার ভিত্তি ছিলো ২০। আবার, আমরা যেমন ডান দিক থেকে শুরু করে বাঁ দিকে একক দশক বলে এগিয়ে যাই, মায়ারা তেমনি নীচে থেকে শুরু করে উপর দিকে এক, কড়ি এভাবে অংক লিখতো। অনেকে মনে করেন যে মায়ারা শূন্য ও স্থানীক পদ্ধতিতে অংক লেখার পদ্ধতি নিজেরাই আবিষ্কার করেছিলো। কিন্তু মায়াদের অনেক আগেই যে ব্যাবিলনীয়রা শূন্য ও স্থানীক অংক পাতন পদ্ধতির আবিষ্কার করেছিলো তার প্রমাণ রয়েছে। (ব্যাবিলনীয়রা অবশ্য ৬০ ভিত্তিক অংক পাতন পদ্ধতি অনুসরণ করতো।) এটা তাই অসম্ভব নয় যে ব্যাবিলনীয় উৎস থেকেই মায়ারা শূন্য ও অংক লেখার পদ্ধতি শিখেছিলো। তবে এ বিষয়ে পণ্ডিতরা এখনও কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন নি।

মায়াদের রাজ্যে ছাত্রদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় ছিলো। তবে প্রধানত পুরোহিতদের জন্যই এ বিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এ সব বিদ্যালয়ে কি কি শেখানো হতো তা জানা যায় নি; তবে সেখানে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বিষয়ে যে বিশেষভাবে শিক্ষা প্রদান করা হতো

তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ধর্মীয় সংস্থার অন্তর্ভুক্ত মহিলাদের জন্য আলাদা মঠ ছিলো। মায়াদের মধ্যে পরবর্তীকালের আজটেকদের মতো যুদ্ধ প্রবণতা বা রণ লিপ্সা ছিলো না। মায়াদের প্রয়াস প্রধানত শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের দিকেই নিয়োজিত হয়েছিলো। তবে মায়াদের কাছে যুদ্ধ একেবারে অজানা বিষয় ছিলো না। মায়াদের বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধও সংঘটিত হয়েছে। তাই মায়াদের সমাজে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও ছিলো।

আজটেক সভ্যতার ইতিহাস

খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দে যখন গুয়াতেমালা ও ইউকাতান অঞ্চলে মায়া সভ্যতার বিকাশ ঘটছিলো, তখন মধ্য-মেক্সিকো অঞ্চলে আনুমানিক ৩০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে টেওটিহুয়াকান শহরকে কেন্দ্র করে এক সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো। বর্তমান 'মেক্সিকো সিটি' নগর থেকে পঁচিশ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিলো টেওটিহুয়াকান নগরটি। তারপর আনুমানিক ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য-মেক্সিকোতে টোলটেক সভ্যতা গড়ে ওঠে। সবশেষে মেক্সিকো অঞ্চলে আজটেক সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো।

টোলটেকদের কাথা

৯০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে মেক্সিকো দেশের মধ্য অঞ্চলে টোলটেক জাতির এক সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো। টোলটেকরা বড় বড় শহর নির্মাণ করেছিলো। টোলটেকদের রাজধানী বা প্রধান শহর ছিলো টোলান নগরী (বর্তমান টুলা)। মেক্সিকো সিটি নগরী থেকে ষাট মাইল উত্তর পশ্চিম দিকে টোলান নগরীটি অবস্থিত ছিলো। টোলটেকরা বড় বড় দালান-কোঠা, মন্দির ও পিরামিড তৈরি করতো। এরা মায়াদের অনুকরণ করে লেখার কৌশল ও পঞ্জিকা তৈরির কৌশল আয়ত্ত করে-ছিলো। টোলটেকদের রাজ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিলো।

১০০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে নহুয়া ভাষাভাষী কতগুলো জাতির আক্রমণে টোলটেক সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। এ সকল জাতির মধ্যে কুলহুয়া জাতি ছিলো বিশেষ পরাক্রমশালী। কুলহুয়াদের প্রধান শহরের নাম ছিলো কুলহুয়াকান। এ শহরটা ছিলো টেক্সকোকো হ্রদের দক্ষিণ তীরে। এ সময়ে টেক্সকোকো হ্রদের পূর্ব তীরে আরেকটা শক্তিশালী নগর রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিলো, তার নাম ছিলো টেক্সকোকো নগর। এ শহরের মানুষরাও ছিলো নহুয়া ভাষাভাষী। বর্তমান মেক্সিকো দেশের রাজধানী 'মেক্সিকো সিটি' নগরটি যেখানে অবস্থিত সে জায়গাতেই তখন ছিলো টেক্সকোকো হ্রদ। (আসলে এ হ্রদের প্রকৃত নাম কি তা বলা কঠিন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক একে মেক্সিকো হ্রদ বলেছেন, অন্য কোনো ঐতিহাসিক হয়তো একে বলেছেন টেক্সকোকো হ্রদ। হ্রদটি এখন শুকিয়ে গেছে আর হ্রদের মধ্যবর্তী নগরগুলোর ধ্বংস-স্তূপের উপর গড়ে উঠেছে বর্তমান কালের 'মেক্সিকো সিটি' নগরী।)

আজটেক সভ্যতা কাকে বলে

উপরোক্ত নহুয়া ভাষাভাষীরা মধ্য মেক্সিকো অঞ্চলে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলো তার নাম আজটেক সভ্যতা। প্রথমে ১(00 খ্রীষ্টাব্দের অল্পকাল পরেই কুলহুয়া জাতির মানুষ, টেক্সকোকো রাজ্যের মানুষ, টেপানেক জাতির মানুষ ও অন্যান্যরা মধ্য মেক্সিকো উপত্যকায় মূলত একই ধরনের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলো। এ সংস্কৃতিরই নাম দেয়া হয়েছে আজটেক সভ্যতা ও সংস্কৃতি। ১২00 খ্রীষ্টাব্দের দিকে এ অঞ্চলে টেনোচকা নামে আরেকটি নহুয়া ভাষাভাষী জাতি এসে বসবাস স্থাপন করে। টেনোচ্কারা টেক্সকোকো হ্রদের মাঝখানে একটা দ্বীপে বাস করতে শুরু করেছিলো। কালক্রমে, আনুমানিক ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে বা তার কিছু আগে, টেনোচ্কারা ঐ দ্বীপ টেনোচ্টিটলান নামে একটা নগর স্থাপন করে। এ টেনোচ্কারাই ক্রমেক্রমে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং সমগ্র মেক্সিকো অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। টেনোচ্কারা মধ্য মেক্সিকোতে দেরিতে এলেও তারা আজটেক সভ্যতাকে সফলভাবে গ্রহণ করেছিলো এবং সমগ্র মেক্সিকো অঞ্চলে তার প্রসার ঘটিয়েছিলো। তাই টেনোচ্কাদেরও আজটেক নামে অভিহিত করা হয়। টেনোচ্কাদের রাজধানী ছিলো টেনোচ্টিটলান। এ টেনোচ্টিটলান নগরের ধ্বংসাবশেষের উপরেই

গড়ে উঠেছে বর্তমান মেক্সিকো দেশের রাজধানী 'মেক্সিকো সিটি' নগরটি। তাই টেনোচ্‌কাদের বলা চলে 'মেক্সিকো নগরের আজটেক'।

১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন স্পেনীয়রা মেক্সিকো আক্রমণ করেছিলো তখন তারা দেখতে পায় যে টেনোচ্‌কারাই সমগ্র মধ্য মেক্সিকো অঞ্চলের আজটেক সভ্যতার উপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে। এ টেনোচ্‌কা জাতির রাজারাই ইউরোপীয়দের কাছে আজটেক রাজা নামে পরিচিত হয়েছিলো। এখনও সাধারণভাবে আজটেক রাজা বা আজটেক সম্রাট বলতে টেনোচ্‌কা জাতির রাজাদেরই বোঝান হয়ে থাকে, যদিও ঐ একই সময়ে মধ্য মেক্সিকো অঞ্চলে টেনোচ্‌কাদের পাশাপাশি অন্য দুএকটি রাজবংশের রাজারাও (যথা, টেক্সকোকো ও টাকুবা রাজ্যের রাজারা) রাজত্ব করে গেছেন। আমরা এখানে অবশ্য আজটেক রাজা হিসেবে শুধুমাত্র টেনোচ্‌কা জাতির রাজাদের ইতিহাসই বর্ণনা করবো।

টেনোচ্‌কারা কোথা থেকে এল

টেনোচ্‌কারা (অর্থাৎ 'মেক্সিকো শহর' অঞ্চলের আজটেকরা) দাবি করে যে তারা আগে মেক্সিকো দেশের পশ্চিম অঞ্চলে আজ্‌ট্‌লান নামে একটা স্থানে বাস করতো। ১১৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তারা এখান থেকে বের হয়ে নতুন বাসভূমির সন্ধানে পূর্ব দিকে যাত্রা করে। চলতে চলতে তারা কিছু দূর অন্তর অন্তর এক একটা স্থানে থামতো এবং সেখানে এক বছর বা দু'বছর থাকতো। তারপর আবার অগ্রসর হয়ে নতুন জায়গার সন্ধান করতো। এ ভাবে অগ্রসর হতে হতে টেনোচ্‌-কারা শেষ পর্যন্ত মেক্সিকোর মধ্য অঞ্চলের টেক্সকোকো হ্রদের তীরে এসে পৌঁছায়। এখন যেখানে মেক্সিকো শহরটি অবস্থিত সেখানেই আগে ছিলো টেক্সকোকো হ্রদ। এ অঞ্চলে তখন টেপানেকদের আধিপত্য ছিলো। টেপানেকদের অনুমতি নিয়েই শুধু টেনোচকারা টেক্সকোকো হ্রদ অঞ্চলে আসতে পেরেছিলো।

কিছুকালের মধ্যেই টেনোচ্‌কাদের নানা রকম উৎপাতে বিরক্ত হয়ে টেপানেক, কুলহুয়া প্রভৃতি জাতিরা টেনোচকাদের আক্রমণ করে। শেষ পর্যন্ত টেনোচকাদের একটা বড় অংশ কুলহুয়াদের অধীনে বন্দী ভূমিদাস হিসেবে থাকতে বাধ্য হয়। টেনোচকাদের একটা অংশ অবশ্য পালিয়ে টেক্সকোকো হ্রদের মাঝখানের দ্বীপে চলে যায়।

কিছুকাল পরে কুলাহুয়ারা তাদের প্রতিবেশীর সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে বন্দী ভূমিদাস টেনোচ্‌কারা কুলহুয়াদেরও পক্ষে যুদ্ধ করার সুযোগ লাভ করে। এ যুদ্ধে টেনোচ্‌কারা যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়ে কুলহুয়াদের নেতা কক্সকক্সকে খুশি করতে সমর্থ হয়। তখন টেনোচ্‌কারা তাদের দলপতির সাথে কক্সকক্সের মেয়ের বিয়ে দেয়ার জন্য তার কাছে আবেদন করে। কক্সকক্স এ প্রস্তাবে সম্মত হলে টেনোচকারা কৃতজ্ঞ চিত্তে তার মেয়েকে এনে দেবতার উদ্দেশ্যে তাকে বলি দেয়। পরে সে রাজকন্যার গায়ের চামড়া খুলে নিয়ে একজন পুরোহিতের গায়ে পরিয়ে দেয়া হয়। এভাবে ঐ রাজকন্যাকে দেবীতে রূপান্তরিত করা হয়। পরে রাজকন্যার পিতা ঐ ধর্মীয় উৎসবে এসে সব ব্যাপার জেনে দুঃখে-ক্ষোভে বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং সমস্ত টেনোচ্‌কাদের হত্যা করার নির্দেশ দেন। ভীত সন্ত্রস্ত টেনোচ্‌কারা প্রাণ নিয়ে হ্রদের দিকে পালিয়ে যায়। এখানে আগে থেকেই টেনোচ্‌কাদের একটা দল বাস করছিলো। এভাবে টেক্সকোকো হ্রদের দ্বীপে বিচ্ছিন্ন টেনোচ্‌কাদের দুই দলের মিলন হয়। উল্লেখযোগ্য যে, শেষোক্ত দল কুলহুয়াকানদের নিকট থেকে যেটুকু সভ্যতা আয়ত্ত করেছিলো সে সভ্যতার বীজ তারা ঐ দ্বীপে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলো। এদের দরুনই ঐ দ্বীপে পাথরের দালান-কোঠা ও মন্দির নির্মাণ সম্ভব হয়েছিলো। এরাই রাজতন্ত্র ও রাজ বংশের ধারণা ঐ দ্বীপে নিয়ে গিয়েছিলো।

টেনোচ্‌কারা টেক্সকোকো হ্রদের মধ্যে দ্বীপের উপর যে নগর গড়ে তুলেছিলো তার নাম ছিলো টেনোচ্‌টিট্‌লান। ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই এ শহর যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো। ঐ সময়ে ঐ হ্রদে অন্য এক দ্বীপের উপর আরেকটি নগর গড়ে উঠেছিলো; তার নাম ছিলো ট্লাল্‌টেলোল্‌কো। এ নগরের অধিবাসীরা ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে থেকেই এ দ্বীপে বাস করতো।

টেনোচ্‌কা তথা আজটেক সম্রাটদের ইতিহাস

টেনোচ্‌কারা রাজার বংশের একজন মানুষকে নিজেদের রাজা হিসেবে পাওয়ার জন্য কুলহুয়াকানদের কাছে আবেদন জানায়। কুলহুয়া-কানরা তাদের কাছে একজন রাজাকে পাঠিয়েও দেয়। এ রাজার নাম আকামাপিচ্‌ট্‌লি। এ রাজা ১৩৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে টেনোচ্‌-কাদের রাজা হিসেবে টেনোচ্‌টিট্‌লানে রাজত্ব করেছিলেন। টেনোচ্‌-কারা অবশ্য তখন টেপানেকদের মিত্র ছিলো এবং তাদের কর প্রদানও করতো।

আকামাপিচ্‌ট্‌লির মৃত্যু হলে ২য় হুইট্‌জিল্‌হুইট্‌ল্‌ রাজা হন। এর পর রাজা হন হুইট্‌জিলেহুইট্‌ল্‌-এর বৈমাত্রেয় ভাই চিমাল পোপোকা। চিমাল পোপোকা ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৪২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইতিমধ্যে টেপানেকরা কুলহুয়াকান, টেক্সকোকো প্রভৃতি রাজ্য ও তাদের অধীনস্ত অঞ্চলগুলো দখল করে নেয়। টেপানেকদের রাজা টেজোজোমোক ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে টেক্সকোকো জয় করে নেয়। ১৪২৭ খ্রীষ্টাব্দে টেজোজোমোক মারা গেলে তার ছেলে ম্যাক্সট্‌লা টেপানেকদের রাজা হয়। টেপানেকদের এ নতুন রাজা আজটেক রাজা চিমাল পোপোকাকে হত্যা করে টেনোচ্‌টিট্‌লানকে জয় করে নেয়। ম্যাক্সট্‌লা ট্‌লাল্‌টেলোল্‌কো রাজ্যকেও জয় করে নেয়।

টেনোচ্‌টিট্‌লানের টেনোচ্‌কারা টেপানেকদের অধীনতা থেকে মুক্তি লাভের জন্য অধীর হয়ে উঠেছিলো। হ্রদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত ট্লাকোপান বা (টাকুবা) নগরের মানুষরাও টেনোচ্‌কাদের প্রতি সহানুভূতি দেখায়। টেক্সকোকো রাজ্যের পরাজিত মানুষরাও মুক্তি লাভের জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। টেক্সকোকো রাজ্যের সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী নেজাহুয়াল কয়োট্‌ল্‌ তখন টেপানেকদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য দূরের পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলো। তিনি এসে টেনোচ্‌কাদের নতুন রাজা ইট্‌জ্‌কোট্‌ল্‌-এর সাথে যোগদেন। এ ভাবে ট্লাকোপান (টাকুবা) ও টেক্সকোকো রাজ্যের মানুষরা টেনোচ্‌-কাদের (অর্থাৎ আজটেকদের) সাথে একজোট হয়ে টেপানেকদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলো। এ তিন শক্তির আক্রমণের মুখে টেপা-নেকরা পরাজিত হলো। এ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আজটেকরা শক্তিশালী হয়ে উঠলো এবং হ্রদের তীরেও কিছু জমি অধিকার করলো। এ সময় আজটেকদের রাজা ছিলেন ইট্‌জ্‌কোট্‌ল্‌। তিনি ১৪২৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। এখন থেকে আমরা টেনোচ্‌কাদের শুধুমাত্র আজটেক নামেই অভিহিত করবো।

ইট্‌জ্‌কোট্‌ল্‌ই টেনোচ্‌কাদের আজটেক সভ্যতা গ্রহণ ও বিকশিত করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি রাজকর্মচারীদের বিভিন্ন পর্যায়ে বিন্যস্ত করে শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে পুরোহিত তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি টেনোচটিটলান শহরটিকে বড় করে গড়ে তোলেন এবং বাঁধের মাধ্যমে দ্বীপের সাথে মূল ভূখণ্ডের সংযোগ সাধন করেন। ইট্‌জ্‌কোট্‌ল্‌ ক্রমে মেক্সিকো উপত্য-কায় স্বাধীন জাতিসমূহকে আজটেকদের রাজ্যের অধীন নিয়ে আসেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আজটেকদের এ সকল বিজয় অভিযানে টাকুবা ও টেস্ককোকোর রাজারাও সঙ্গী এবং

ভাগীদার হিসেবে থাকতো। তবে এ তিন শক্তির জোটের মধ্যে আজটেকরাই ক্রমে প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়েছিলো।

ইট্‌জ্‌কোট্‌ল্‌-এর মৃত্যুর পর ১ম মন্টেজুমা ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে আজটেকদের রাজা হন। তিনি পূর্ব দিকে পুয়েব্‌লা ও ভেরাক্রুজ পর্যন্ত আজটেক রাজ্যের বিস্তার সাধন করেছিলেন। তিনি দক্ষিণ দিকেও রাজ্য জয় করেছিলেন। তাঁর আমলে টেনোচটিটলান নগরের সাংস্কৃতিক ও স্বাস্থ্যগত মানের উন্নতি সাধিত হয়েছিলো। তিনি নগরে ভাল পানি সরবরাহের জন্য দূরের চাপুল্‌টেকের ঝরনা থেকে ঐ নগর পর্যন্ত একটি পানির নালা ও একোয়েডাক্ট নির্মাণ করেন। তিনি দ্বীপ-নগরটির পূর্ব-সীমায় এক মস্ত বড় বাধ নির্মাণ করেন যাতে বর্ষাকালেও হ্রদের পানি রাজধানীতে প্রবেশ করতে না পারে।

পুয়েবলা অঞ্চলটিতে ধর্মীয় আচরণের অনেক জটিল বিকাশ ঘটেছিলো। আজটেকরা পুয়েবলা জয় করাতে এ সকল ধর্মমতের সংস্পর্শে আসে। তার ফলে এ অঞ্চলের নতুন দেবদেবীর নামে অনেক মন্দির আজটেকদের রাজ্যে তৈরি করা হয়। মণ্টেজুমা মেক্সিকো অঞ্চলে প্রচলিত একটি নৃশংস প্রথাকে নতুন করে প্রচলন করেছিলেন। আজটেকরা দেবতার উদ্দেশ্যে নরবলি দিতো। সাধারণত যুদ্ধ বন্দীদেরই দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হতো। যখন যুদ্ধ থাকতো না তখন মণ্টেজমা 'ফুলের যদ্ধ' শুরু করার রীতি প্রবর্তন করলেন। এ অনুষ্ঠানে দুই দল যোদ্ধার মধ্যে লড়াই হতো শুধু যুদ্ধবন্দী সংগ্রহ করার জন্য। এ হতভাগ্য বন্দীদের দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হতো।

১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ১ম মণ্টেজুমার মৃত্যু হলে, তাঁর ছেলে আক্সায়াক্যাট্‌ল্‌ রাজা হন। তিনি আজটেকদের আধিপত্য পশ্চিমে ও দক্ষিণ দিকে আরও অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। এ আজটেক সম্রাট পাশের দ্বীপ নগর, টলাল্‌ টেলোল্‌কোর রাজাকে হত্যা করে এ নগরের

উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। এ নগরটি এতকাল পর্যন্ত স্বাধীন ছিলো এবং আজটেকদের সাথে সহযোগিতাও করতো। এ নগরটি সমগ্র মেক্সিকো এলাকার মধ্যে একটা ব্যবসার কেন্দ্র রূপে পরিচিত ছিলো।

আক্সায়াক্যাটল্-এর আমলে আজটেকদের ধর্মীয় শিল্পকলা চরম বিকাশ লাভ করেছিলো। তাঁর সময়েই আজটেকদের বিশাল পাথরের তৈরি পঞ্জিকাটি নির্মিত হয়েছিলো। গোলাকার এ পাথরের ফলকের ওজন ছিল ২০ টনের বেশি (প্রায় সাড়ে পাঁচশ মন) এবং তার ব্যাস ছিলো ১৩ ফুট। এ পাথরের ফলকের উপর দিন মাস বছর প্রভৃতির হিসাব এবং জ্যোতির্বিদ্যা ও পঞ্জিকার অনেক হিসাব খোদাই করা হয়েছিলো।

১৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে. আক্সায়াক্যাট্‌ল-এর রাজত্ব কালের শুরুতে, টেস্ককোকোর রাজা নেজাহুয়াল কয়োটল মারা যান। ইনি ছিলেন প্রাচীন আমেরিকার ইতিহাসের এক স্মরণীয় ব্যক্তি। ইনি টেস্ককোকো রাজ্যকে টেপানেকদের আধিপত্য থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং আজ-টেকদের সাথে মিলে নিজ রাজ্যের পরিধি বাড়িয়েছিলেন। অবশ্য অনেক আগে থেকেই টেস্ককোকো রাজ্য মেক্সিকো অঞ্চলের এক বড় এলাকায় তার আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলো। টেপানেকদের আধিপত্য থেকে মুক্ত হওয়ার পর টেক্সকোকো আবার ঐ সব রাজ্য থেকে কর আদায় করতে শুরু করেছিলো। নেজাহুয়াল্‌কয়োট্‌ল্ অনেক দালান-কোঠা, মন্দির ও সরকারী ভবন নির্মাণ করেন। তিনি ধর্মচর্চা ও শিল্প কলায়ও গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন। তিনি একজন বড় কবি ও বাগ্মী ছিলেন। ধর্মীয় প্রয়োজনে তিনি জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রের চর্চাও করতেন। তিনি টেক্সকোকো রাজ্যে উত্তম শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। টেনোচ্‌টিটলানের সাথে তিনি যে এতকাল পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছিলেন তাতে তাঁর প্রজ্ঞারই পরিচয়

পাওয়া যায়। কারণ রাজ্যলোভী আজটেকরা সর্বদাই ষড়যন্ত্র, হত্যা বা যুদ্ধের মাধ্যমে তাঁর রাজ্য জয় করার জন্য উৎসুক ছিলো।

নেজাহুয়াল কয়োটল্-এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নেজাহুয়ালপিলি টেক্সকোকোর রাজা হন এবং ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত রাজত্ব করেন। নেজাহুয়ালপিলি ১ম মণ্টেজুমার এক বোনকে বিয়ে করেছিলেন এবং পরে কোনো কারণবশত ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এ রানীকে হত্যা করেছিলেন। এর ফলে আজটেকদের সাথে তাঁর বিরোধ দেখা দিয়েছিলো।

আজটেক সম্রাট আক্সায়াক্যাটল ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মারা গেলে তাঁর ভাই টাইজক আজটেকদের সম্রাট হন। সম্রাট হয়েই তিনি যুদ্ধ দেবতা ও বৃষ্টির দেবতার উদ্দেশ্যে দুটো মন্দির নতুন করে নির্মাণ করতে শুরু করেন। তিনি একটা বিশাল পাথরের পাত্র তৈরি করে-ছিলেন যার মধ্যে দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেয়া মানুষের হৃৎপিণ্ডকে পোড়ান হতো।

১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে টাইজক মারা গেলে তাঁর ভাই আহুইট্জোট্ল্ আজটেকদের রাজা হন। তিনি সম্রাট হয়েই যুদ্ধ দেবতার মন্দির নির্মাণ সমাপ্ত করার উদ্যোগ নেন। মন্দিরের উদ্বোধনের জন্য প্রচুর সংখ্যক নরবলির প্রয়োজন দেখা দেয়। আহুইটজোট্ল্ তখন নেজাহুয়ালপিলির সাহায্য নিয়ে দু বছর ধরে উত্তর অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে ২০ হাজার বন্দী ধরে নিয়ে আসেন। এ সব বন্দীদের দুই লাইন সার বেঁধে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আহুইটজোট্ল্ ও নেজাহুয়ালপিলি নিজ হাতে পাথরের ছুরি দিয়ে তাদের বুক চিরে চিরে হৃৎপিণ্ড বের করেন ও সেগুলোকে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। তারপর অন্যান্য উচচপদস্থ রাজকর্মচারি এবং পুরোহিতরাও অনুরূপ সুযোগ লাভ করেন। এ রকম নৃশংস পদ্ধতিতে হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করে দেবতাকে উৎসর্গ করা আজটেক

ধর্মের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিলো। কিন্তু এক সাথে ২০ হাজার মানুষকে বলি দেয়ার মতো ভয়ঙ্কর হত্যাযজ্ঞ আজটেক ইতিহাসেও বেশি ঘটে নি।

১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে একটা বাঁধ মেরামতের কাজ পর্যবেক্ষণ করার সময়ে এক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে আহুইটজোটল মারা যান। তখন আক্সায়াক্যাট্ল্-এর ছেলে ২য় মণ্টেজুমা আজটেকদের সম্রাট হন। মণ্টেজুমাও একবার এক বিদ্রোহী রাজ্য থেকে ১২ হাজার মানুষকে বন্দী করে এনে দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দিয়েছিলেন। এ মণ্টে-জুমার এক বোনকেই টেক্সকোকোর রাজা হত্যা করেছিলেন। মাণ্টেজুমা তাঁর বোনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে কৌশলে টেক্সকোকোর সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করেন। তারপর ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে টেক্সকোকোর রাজা নেজাহুয়ালপিলি মারা গেলে মণ্টেজুমা সে রাজ্যে নিজের পছন্দ মত একজনকে রাজা মনোনীত করেন। এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে টেক্সকোকোর মানুষ বিদ্রোহ করে। এভাবে আজটেকদের সাথে গড়ে ওঠা টেক্সকোকোর দীর্ঘকালের মৈত্রী ও যুদ্ধজোট ভেঙ্গে যায়। ১৫১৯ খ্রীষ্টব্দে স্পেনীয় সেনাপতি কর্টের্জ মেক্সিকো আক্রমণ করলে প্রথম দফায় মণ্টেজুমা নিহত হন (১৭২০)। এর পর কুইট-লাহুয়াক আজটেকদের রাজা হন। কিন্তু তিনি চারমাস পরেই বসন্ত রোগে মারা যান। তারপর আজটেকদের রাজা হন কুয়াউটেমক। চার বছর পর ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে কর্টের্জ-এর হাতে বন্দী হয়ে তিনি প্রাণ হারান। এভাবে স্পেনীয়দের আক্রমণে আজটেক সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়।

টেনোচ্‌টিট্‌লান-এর সম্রাটদের আজটেক্‌ তালিকা ও রাজত্বকাল

রাজা	রাজত্বকাল
১. আকামা পিচ্‌ট্‌লি	১৩৭৬ খ্রীঃ—১৩৯১ খ্রীঃ
২. ২য় হুইটজিল্‌ হুইট্‌ল্‌	১৩৯১—১৪১৪ খ্রীঃ
৩. চিমাল পোপোকা	১৪১৪—১৪২৮ খ্রীঃ
৪. ইটজ্‌কোট্‌ল্‌	১৪২৮—১৪৪০ খ্রীঃ
৫. ১ম মণ্টেজমা	১৪৪০—১৪৬৯ খ্রীঃ
৬. আক্সায়াক্যাট্‌ল্‌	১৪৬৯ –১৪৮১ খ্রীঃ
৭. টাইজক্‌	১৪৮১—১৪৮৬ খ্রীঃ
৮. আহুইট্‌জোট্‌ল্‌	১৪৮৬ – ১৫০৩ খ্রীঃ
৯. ২য় মণ্টেজুমা	১৫০৩ ১৫২০ খ্রীঃ
১০. কুইট্‌লাহুয়াক্‌	১৫২০—খ্রীঃ (৪মাস)
১১. কুয়াউটেমক্‌	১৫২০—১৫২৪ খ্রীঃ

আজটেক অর্থনীতি

আজটেকদের জীবনযাত্রার ভিত্তি ছিলো কৃষি কাজ। ভুট্টা ছিলো তাদের প্রধান খাদ্যশস্য। আজটেকদের মধ্যে গোষ্ঠী এবং গোত্র প্রথা বজায় ছিলো। গোষ্ঠী প্রধানরা বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে চাষের জমি বিতরণ করে দিতেন। গোত্র প্রধানরা আবার গোত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন পরিবারের কর্তাদের মধ্যে ন্যায্যভাবে জমি ভাগ করে দিতেন। জমির একটা অংশ সর্দার ও পুরোহিতদের জন্য, যুদ্ধের রসদের জন্য ও রাজার খাজনা দেয়ার জন্য রাখা হতো। সমাজের সব মানুষ মিলে বেগার খেটে এসব জমিতে ফসল ফলাতো। কোনো কৃষকের মৃত্যু হলে তার জমি তার ছেলেরা পেতো। কোনো কৃষক অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে অথবা জমিতে আবাদ না করলে তার জমি গোত্রের হাতে ফিরে যেতো এবং নতুন ভাবে সে জমিকে বিতরণ করা হতো।

জনসংখ্যা বেড়ে গেলে ক্রমশ জমির অভাব দেখা দেয়। আজটেকরা তখন মেক্সিকোর মধ্যভাগে অবস্থিত উপত্যকায় চলে আসে। এখানে তারা টেক্সকোকো হ্রদের তীরে এবং হ্রদের মাঝখানেও বসতি স্থাপন করে। হ্রদের মধ্যে বাস করার জন্য তারা কৃত্রিম দ্বীপ তৈরি করতো। হ্রদের মধ্যে বেড়া দিয়ে তার ভিতরে মাটি ফেলে ফেলে দ্বীপ তৈরি করা হতো। হ্রদের উপকূলের বিস্তীর্ণ

জলাভূমির মাটি দিয়ে এভাবে উর্বর দ্বীপ তৈরি করা হয়। এ সব দ্বীপের জমিতে চাষ করে ভালো ফসল পাওয়া যেতো। চাষের এ পদ্ধতিকে বলা হয় চিনাম্পা। চিনাম্পা মানে হলো 'ভাসমান বাগান'।

আজটেকদের মধ্যে হস্তশিল্প এবং ব্যবসার কিছুটা বিকাশ ঘটেছিলো। আজটেকদের কোনো কোনো শহর ও গ্রাম হয়তো এক এক ধরনের পণ্য উৎপদান দক্ষতা অর্জন করেছিলো। কেউ হয়তো ভাল মাটির পাত্র তৈরি করতো, কেউ মরিচের চাষ করতো, কেউ ভাল পাথরের হাতিয়ার তৈরি করতো। এ সকল পণ্য বিক্রি বা বিনিময় করার জন্য এক এক অঞ্চলে মেলা বা বাজার বসতো। অনেক দূর দূর অঞ্চল থেকে মানুষ এ সব মেলায় আসত জিনিসপত্র কেনার জন্য। টলালটেলোকো শহরে একটি স্থায়ী বাজার ছিলো। রোজ শহরে সেখানে বাজার বসতো। এ বাজারে এত সব অপূর্ব পণ্যের সমাহার ঘটতো যে স্পেনীয়রা পর্যন্ত তা দেখে মুগ্ধ ও ঈর্ষকাতর হয়েছিলো।

আজটেকদের সমাজে মুদ্রা বা টাকা পয়সার প্রচলন ছিলো না। তারা বিনিময়ের মাধ্যমেই ব্যবসা করতো। তবে বিনিময়ের কাজে সহায়তার জন্য কয়েকটা জিনিসকে মুদ্রার বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা হতো। যথা, কাকাও-এর দানা; সোনার গুঁড়ো ভর্তি পাখির পালক এবং তামার তৈরি পাতলা ছুরি। তবে এ তিনটের মধ্যে কাকাও-এর দানাই লোকে বেশি পছন্দ করতো। দুটো জিনিস বিনিময় করতে গেলে হয়তো দেখা যেত যে তাদের দামের মধ্যে সামান্য পার্থক্য হচ্ছে। তখন কাকাও-এর দানা দিয়ে ঐ পার্থক্যটুকু মিল করা হতো।

আজটেকদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান পদার্থ ছিলো জেড পাথর। তারা সোনাকে খুব মূল্যবান মনে করতো না। তাদের কাছে শুধু গায়না হিসেবেই সোনার দাম ছিলো। আজটেকদের কাছে সোনার

চেয়ে রূপার দাম সম্ভবত বেশি ছিলো, কারণ রূপার খণ্ড তাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য ছিলো। উল্লেখ করা যেতে পারে যে আজটেকরা রূপার আকর গলিয়ে রূপা তৈরি করতে পারতো না। তাই তারা পাহাড়ের গায়ের ভিতরে লুকিয়ে থাকা রূপা বা সোনার শিরা থেকে ঐ সব ধাতু সংগ্রহ করতো। আজটেকরা সোনার চেয়ে জেড পাথরকে বেশি মূল্যবান মনে করতো বলে এক পর্যায়ে খুবই বিপদগ্রস্ত হয়েছিলো। স্পেনীয়রা আজটেকদের রাজ্য দখল করে যখন সমস্ত মূল্যবান সম্পদ হাজির করতে বলে তখন আজটেকরা সোনা না এনে জেড পাথর, টারকয়েজ পাথর প্রভৃতি এনে হাজির করে। তাদের এ আনুগত্যকে অবাধ্যতা ভেবে কর্টেজ ও তার সৈন্য সামন্ত খুবই বিরক্ত হয়েছিলো। আজটেকরা অবশ্য তখনও জানতো না যে স্পেনীয়রা সোনার লোভেই আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে মেক্সিকোতে গিয়েছিলো।

আজটেকরা ভুট্টা ছাড়াও অনেক রকমের তরিতরকারি ও ফসলের চাষ করতো। তারা টমেটো, লাউ, মটরশুটি জাতীয়-ফসল, কোকো, লঙ্কা মরিচ, তামাক, তুলা প্রভৃতির চাষ করতো।

আজটেকরা ম্যাগুয়ে নামে একটা গাছের চাষ করতো। এ গাছের রস থেকে তারা একরকম মদ তৈরি করে খেতো। এ মদের কিছুটা পুষ্টিগুণও ছিলো। এ গাছের ছাল থেকে সূতা এবং কাপড়, আর পাতা দিয়ে ঘরের ছাদ ও গাছের কাঁটা দিয়ে সুই তৈরি করা হতো।

আজটেকরা নলখাগড়ার ফাঁকা নলে তামাক পুরে সিগারেটের মতো করে ধূমপান করতো। তারা গাছের রস থেকে রাবার তৈরি করতো, সে রাবার দিয়ে বল তৈরি করতো। আজটেকরা বল খেলতো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে।

আজটেকরা লাঙলের ব্যবহার জানতো না। তারা কোদাল বা শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ে চাষ করতো। তবে, আজটেকরা পানি সেচ করার কৌশল আয়ত্ত করেছিলো। আজটেকরা চাষের কাজে দক্ষতা অর্জন করলেও, পশুপালন বা পশু-শক্তিকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে তারা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেনি। আজটেকরা মহিষ জাতীয় কোনো প্রাণীকে পোষ মানাতে শেখে নি। তারা অবশ্য কয়েক ধরনের কুকুর পুষতো। এক ধরনের কুকুরকে তারা খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করতো, তবে কুকুরকে তারা কখনও স্লেজ গাড়ি টানার কাজে ব্যবহার করেনি। টার্কি নামক মুর্গী জাতীয় প্রাণীকে তাঁরা পোষ মানিয়েছিলো; তারা হাঁসকে পোষ মানিয়েছিল এমন প্রমাণও কিছু কিছু পাওয়া যায়।

আজটেকদের হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি ছিলো আদিম ধরনের। কাঠের খোন্তা বা শাবল ছিলো তাদের প্রধান কৃষিযন্ত্র, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। গম পেশার জন্য তারা যে যাঁতা ব্যবহার করতো তা ছিলো আমাদের মশলা পেশার শিল নোড়ার মতো। আমরা যেটাকে শিল বা পাটা বলি আজটেকরা তাকে বলতো মেটাটে; আর আমরা যাকে পুতা বা নোড়া বলি তারা তাকে বলতো মানো। চামড়া, মাংস ও অন্যান্য জিনিস কাটার জন্য আজটেকরা পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করতো। তামা দিয়ে তারা সুঁই, কুড়াল ও গয়না বানাতো। আজটেকরা মিশরীয় অথবা ব্যবিলনীয়দের মতো আকর গলিয়ে তামা বানাতে পারতো না। তারা পাহাড়ের গায়ের ভিতর যে বিশুদ্ধ তামা পেতো তাকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে বিভিন্ন আকৃতির জিনিস বানাতো। তবে আজটেকরা বিশুদ্ধ তামাকে গলিয়ে তাকে ছাঁচে ঢেলেও কুড়াল প্রভৃতি বানাতে পারতো। আজটেকরা 'সিরে পারডু' বা 'মমলুপ্তি' পদ্ধতিতে ছাঁচে ঢেলে তামা বা সোনার গয়না, ঘণ্টা

প্রভৃতি তৈরি করতো। ইনকাদের ইতিহাস বর্ণনাকালে এ পদ্ধতির বিবরণ দেয়া হয়েছে। অব্‌সিডিয়ান পাথর দিয়ে আজটেকরা ধারাল অস্ত্র ও হাতিয়ার বানাতে পারতো। (অবসিডিয়ান আসলে এক ধরনের প্রাকৃতিক কাঁচ; আগ্নেয়গিরির লাভার মধ্যে এগুলো পাওয়া যায়।)

আজটেকরা চরকার ব্যবহার জানতো না। তারা কাঠিম দিয়ে সূতা কাটতো এবং আদিম ধরনের তাঁতের সাহায্যে কাপড় বুনতো। তারা রান্নাবান্না এবং খাদ্য শস্য জমা করে রাখার জন্য মাটির পাত্র ব্যবহার করতো। তারা তীর-ধনুক, বর্শা নিক্ষেপক যন্ত্র, বর্শা বা বল্লম, গদা প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহার করতো। আজটেকদের সংস্কৃতিতে যান্ত্রিক আবিষ্কার বিশেষ বিকাশ লাভ করে নি। তবে তাদের কারিগররা সাধারণ হাতিয়ার ব্যবহার করে নানা রকম জিনিসপত্র তৈরির ক্ষেত্রে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।

আজটেকদের সমাজ ও জীবন

আজটেকরা যখন মেক্সিকোর উপত্যকাতে প্রথম এসেছিলো তখন তাদের সমাজ সংগঠন ছিলো উপজাতীয় পর্যায়ের। অর্থাৎ তাদের সমাজ গোত্র ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিলো এবং সমাজে আদিম ধরনের গণতন্ত্র প্রচলিত ছিলো। আত্মীয়-স্বজনদের কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি গোত্র হতো এবং প্রায় ২০টি গোত্র নিয়ে একটি গোষ্ঠী গঠিত হতো। প্রত্যেক গোষ্ঠীর নিজস্ব সর্দার বা দলপতি থাকতো। প্রত্যেক গোষ্ঠী নিজে-দের বিষয় নিজেরাই পরিচালনা করতো। তবে সমগ্র উপজাতীয় স্বার্থের বিষয় বিবেচনা করার জন্য গোষ্ঠী ও সর্দারদের নিয়ে একটা পরিষদ গঠিত হতো। এ পরিষদ সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একজন সর্দার এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য একজন সর্দার নিয়োগ করতো। আজটেকরা যখন চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করতো তখন এই ছিলো তাদের সমাজের গঠন বিন্যাস। পরে যখন আজটেকরা নগররাষ্ট্র গঠন করে এক বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তখন তাদের এ সমাজ সংগঠনই অনেক জটিল হয়ে দাঁড়ায়। তথাপি সাম্রাজ্যের যুগেও টেনোচ্‌কা-আজটেকদের মধ্যে গোষ্ঠি জীবনের অনেক নিয়ম-কানুন ও রীতি-নীতি বজায় ছিলো।

আজটেকদের সমাজে মেয়েদের স্থান ছিলো পুরুষের চেয়ে নীচে, তবে মেয়েদের কতগুলো অধিকার ছিলো। মেয়েরা সম্পত্তির অধিকারী

হতে পারতো এবং প্রয়োজনে আইনের আশ্রয় নিতে পারতো। জীবনে উন্নতি করার সুযোগ অবশ্য শুধু পুরুষদেরই ছিলো। অভিজ্ঞ কৃষক, চতুর শিকারী ও সাহসী যোদ্ধা ও দক্ষ কারিগরদের সম্মান ছিলো সমাজে। আজটেক সমাজে যুবকদের সামনে কৃষি কাজ, কারিগরি ও ব্যবসা বাণিজ্যকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার সুযোগ ছিলো।

আজটেকদের সমাজে দাস ছিলো। যুদ্ধবন্দীদের অবশ্য সচরাচর দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হতো। কিছু যুদ্ধবন্দীকে আবার দাসও বানানো হতো। অনেক গুরুতর অপরাধীকে দাস বানানো হতো। অনেক গরীব লোক ছেলেমেয়েকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দিতো। চুরি ডাকাতির জন্য কঠোর শাস্তি দেয়া হতো। নরহত্যা করলে, এমন কি কোন দাসকে হত্যা করলেও মৃত্যু দণ্ড দেয়া হতো।

টেনোচ্কা-আজটেকদের আমলে মধ্য মেক্সিকোর বিভিন্ন শহরের অধিবাসীরা ভাষা, ধর্ম, রীতিনীতি ও সংস্কৃতিতে এক গোত্রীয় হলেও তাদের মধ্যে কোনো ঐক্যের বোধ ছিলো না। টেনোচ্কারা অর্থাৎ মেক্সিকো নগরীর আজটেকরা মধ্য-মেক্সিকো দেশের প্রায় পুরো অঞ্চলকে অধিকার করলেও, সে অঞ্চলকে আজটেকরা একটা সাম্রাজ্যে পরিণত করতে পারে নি। আজটেকরা বিজিত নগর ও রাজ্যগুলো থেকে কর আদায় করতো। কিন্তু সব রাজ্যের উপর কোনো এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা আজটেকরা আরোপ করতে পারে নি। এ কারণে আজটেক রাষ্ট্রকে সাম্রাজ্য রূপে অভিহিত করা চলে না। তবে টেনোচ্কা-আজটেকদের আমলে মেক্সিকো অঞ্চলের সব নগর ও রাজ্য-সমূহে একই ধরনের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যেতো। এ অর্থে বলা চলে যে টেনোচকা-আজটেকদের রাজত্বকালে মেক্সিকো অঞ্চলে মোটামুটি ঐক্যবদ্ধ একটা সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিলো।

আজটেকদের ধর্ম

মায়াদের মতো আজটেকরাও ছিলো সূর্যের উপাসক। আজটেকদের দেবতারা আজটেকদের মতোই রক্তপিপাসু ছিলো। আজটেকদের বিশাল রাজ্যের অন্তর্গত সব নগরেই বড় বড় পিরামিড নির্মাণ করা হতো। পিরামিডের মাথায় থাকতো সূর্য দেবের মন্দির। মন্দিরের মধ্যে পাথরের বেদী থাকতো। এ সকল বেদীতে সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে নরবলি দেয়া হতো। আজটেকদের নরবলির ধরন ছিলো জীবন্ত মানুষের হৃৎপিণ্ড কেটে বের করে সূর্যের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা। আজ-টেকদের একজন প্রধান দেবতা ছিলেন হুইট জিলোপিচটলি। তিনি ছিলেন যুদ্ধ ও সূর্যের দেবতা।

আজটেকাদের আরেকজন দেবতা ছিলেন কোয়েটজাল কোহুয়া-টল। তিনি ছিলেন বাতাস ও স্বর্গলোকের দেবতা। তাঁর জন্য কোনো নরবলির বিধান ছিলো না। তিনি ছিলেন নম্র স্বভাবের দেবতা। আজটেকদের শিল্পকলায় এ দেবতাকে পালকে ঢাকা সাপ হিসেবে আঁকা হয়েছে। এ সংযুক্ত প্রাণীটি ছিলো পৃথিবী ও আকাশের প্রতীক। পৃথিবী হলো সব মানুষের মা আর আকাশ হলো পিতা। আজটেকরা ছিলো পৃথিবী ও সূর্যের উপাসক।

মায়াদের মতো আজটেকরাও জমাট রবারের বল নিয়ে খেলতো। এ বল খেলা ছিলো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ।

আজটেকদের জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতি

কৃষিকাজ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি প্রয়োজনে আজটেকরা জ্যোতি-র্বিদ্যার চর্চা করতো। আজটেকরা একটা পঞ্জিকা প্রণয়ন করেছিলো। আজটেকরা ২০ দিনে মাস গুণতো এবং এ রকম মাসের ১৮ মাসে বছর হতো। এ বছরের শেষে ৫টা অশুভ দিন যোগ করা হতো। তাই আজটেকদের সৌর বছর ছিলো ৩৬৫ দিনে। আজটেকরা আরেকটা ধর্মীয় 'বছর' অনুসরণ করতো—তাতে ছিলো ২৬০ দিন। ১৩ দিনে সপ্তাহ ধরে ২০টি সপ্তাহ হিসাব করে তারা ২৬০ দিন হিসাব করতো। এ হিসাবটা কেবল ধর্মীয় অনষ্ঠানেই ব্যবহার করা হতো। একটা গোল পাথরের চাকতিতে আজটেকরা তাদের দিন তারিখের হিসাব লিখে রাখতো ; তাকে বলা হয় 'শিলা পঞ্জিকা'।

আজটেকরা বড় বড় পিরামিড ও মন্দির, ধাতুর জিনিস-পত্র প্রভৃতি নির্মাণ করার মতো কারিগরি জ্ঞান আয়ত্ত করেছিলো। আজ-টেকরা এক ধরনের লেখন পদ্ধতি আয়ত্ত করেছিলো। তারা চিত্রলিপি অর্থাৎ ছবির সাহায্যে লিখিতো। এ ধরনের লেখন পদ্ধতি প্রাচীন মিশর ও ব্যাবিলনে প্রচলিত ছিলো।

আজটেকদের গণনা পদ্ধতি ছিলো ২০ ভিত্তিক। তারা সংখ্যা লিখন পদ্ধতিও আয়ত্ত করেছিলো। তারা পর পর বিন্দু সাজিয়ে ১ থেকে ১৯ পর্যন্ত লিখিতো। ২০ বোঝাতে তারা একটা পতাকার ছবি

আঁকতো। পতাকার পর পতাকা সাজিয়ে তারা ১ কুড়ি, ২ কুড়ি প্রভৃতি লিখতো। ২০ কুড়ি বা ৪০০ বোঝাতে তারা ফার গাছের মতো একটা ছবি আঁকতো, এর অর্থ ছিলো অনেকগুলো চুল। পরবর্তী উচচতর একক ছিলো ৮০০০ (২০×২০×২০ বা ২০×৪০০)। একটা ঝোলা বা ব্যাগের ছবি দিয়ে ৮০০০ বোঝান হতো—এর অর্থ ছিল ব্যাগ ভর্তি কোকো দানা।

শিল্পকলা আজটেকদের জীবন থেকে পৃথক বা বিচ্ছিন্ন কিছু ছিলো না, শিল্পকলা ছিলো তাদের জীবনের কার্যবলীর সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

আজটেকদের শিল্প-চর্চার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রকাশ ঘটেছিলো স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে। চিত্রাঙ্কণের ক্ষেত্রে আজটেকরা ছিলো দুর্বল। সঙ্গীতের চেয়ে নাচের ক্ষেত্রে তারা ছিলো বেশি পারদর্শী।

মন্দির, পিরামিড প্রভৃতিতে আজটেক স্থাপত্য শিল্পের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। একটা ধাপ পিরামিডের উপর মন্দিরটা নির্মিত হতো। মায়ারা যেমনভাবে ধাপ পিরামিড ও মন্দির নির্মাণ করতো আজটেকরাও সে কৌশলেই পিরামিড-মন্দির তৈরি করতো। পিরামিড ধাপ এবং মন্দিরের দেওয়ালের পাথরে নানারকম মূর্তি প্রভৃতির চিত্র খোদাই করা হতো।

আজটেকরা ভাস্কর্য শিল্পেও উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছে। আজ-টেকরা দেবদেবীর বড় বড় পাথরের মূর্তি নির্মাণ করতো, ছোট আকৃতির পাথরের মূর্তি প্রভৃতিও তৈরি করতো। আজটেকরা গোল পাথরের চাকতিতে নানা দিনক্ষণের হিসাব ও ঐতিহাসিক সন তারিখ লিখে রাখতো। একে বলা হয় পঞ্জিকা বা ক্যালেণ্ডার।

আজটেকরা পালক দিয়ে সুন্দর সুন্দর মাথার টুপী প্রভৃতি বানাতে পারতো। তারা পশমের কাপড়ে পালক বসিয়ে সুন্দর

রঙবেরঙের কাপড় ও পোষাক বানাতে পারতো। আজটেকরা সুন্দর সুন্দর নক্সা কাটা মাটির পাত্র বানাতে পারতো। তারা কুমারের চাক ব্যবহার করতে জানতো না। পরতের পর পরত কাদামাটি বিছিয়ে তারা হাত দিয়ে সমান ও মসৃণ করে মাটির পাত্র বানাতো। আজটেকরা কাঠের কাজে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেনি। তারা অবশ্য দালানের কড়ি বরগার জন্য কাঠ ব্যবহার করতো, কাঠের ঢোলক এবং ছোট এক ধরনের চেয়ারও বানাতে পারতো। তারা মূলত পাথরের যন্ত্র ও হাতিয়ার দিয়ে কাঠের কাজ করতো।

আজটেকদের লেখন পদ্ধতি খুব উন্নত ছিল না বলে তাদের সাহিত্যের কোনো লিখিত রূপ পাওয়া যায় না। তবে কথকতা এবং লোককাহিনীর মধ্যে তাদের যে সাহিত্য বেঁচে ছিলো তা যথেষ্ট সমৃদ্ধ বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।

ইনকা সভ্যতার ইতিহাস

স্পেনীয় সৈনিক ফ্রান্সিসকো পিজারো যখন ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইনকা সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন তখন ইনকা সম্রাট ছিলেন আতাহুয়ালপা এবং ইনকাদের রাজধানী ছিলো কুজকো শহরে। বর্তমান পেরু রাজ্যে ছিলো কুজকো শহরের অবস্থান এবং এ শহরটি ছিলো আন্দিজ পর্বতমালার উপরে অবস্থিত। ইনকা সাম্রাজ্য তখন উত্তরে ইকুয়েডর থেকে দক্ষিণে চিলির মধ্যভাগ পর্যন্ত পুরো আন্দিজ পর্বতমালা জুড়ে বিস্তৃত ছিলো।

ইনকারা আনুমানিক ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে কুজকো উপত্যকায় এসে বসতি স্থাপন করেছিলো। বহুকাল পর্যন্ত তাদের আধিপত্য কুজকো শহরেই সীমাবদ্ধ ছিলো। মানকো কাপাক ছিলেন প্রথম ইনকা সম্রাট। নবম ইনকা সম্রাট পাচাকুটি ১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনকা সাম্রাজ্যের বিস্তার সাধন শুরু করেন। তার অল্পকালের মধ্যেই ইনকা সাম্রাজ্য উত্তর দক্ষিণে ২৭০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

ইনকা সম্রাটদের যে তালিকাকে ঐতিহাসিকরা মোটামুটি সঠিক বলে গ্রহণ করেছেন সে তালিকাটি নীচে দেয়া হল :

১. মানকো কাপাক (আ. ১২০০ খ্রীঃ)
২. সিন্‌চি রোকা
৩. ল্লকে ইউপানকি

৪.	মায়তা কাপাক	
৫.	কাপাক ইউপানকুই	
৬.	ইনকা রোকা	
৭.	ইয়াহুয়ার হুয়াকাক	
৮.	ভিরাকোচা ইনকা	
৯.	পাচাকুটি ইনকা	(১৪৩৮—১৪৭১ খ্রীঃ)
১০.	টোপা ইনকা	(১৪৭১—১৪৯৩ খ্রীঃ)
১১.	হুয়ায়না কাপাক	(১৪৯৩—১৫২৫ খ্রীঃ)
১২.	হুয়াসকার	(১৫২৫—১৫৩২ খ্রীঃ)
১৩.	আতাহুয়ালপা	(১৫৩২—১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ)

ইনকা কাহিনী অনুসারে, মানকো কাপাক তাঁর দলবল নিয়ে আনুমানিক ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে অগ্রসর হয়ে কুজকো উপত্যকায় এসে পেঁছান। ইনকারা নিজেদের বলতো সূর্য-দেবের প্রিয় জাতি। তাই কুজকো উপত্যকায় আগে থেকে যারা বাস করতো ইনকারা তাদের অত্যাচার করে তাড়িয়ে দেয়। এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইনকাদের রাজ্য কুজকো উপত্যকাতেই সীমাবদ্ধ ছিলো।

স্পেনীয় ঐতিহাসিক গার্সিলাসো ডি লা ভেগা অবশ্য লিখেছেন যে দ্বিতীয় ইনকা সম্রাট সিন্চি রোকা'র আমল থেকেই ইনকা সাম্রাজ্যের বিস্তার সাধনের কাজ শুরু হয় এবং পঞ্চম সম্রাট কাপাক ইউপানকুই-এর আমলে ইনকা সাম্রাজ্য দক্ষিণে টিটিকাকা হ্রদ ও তার দক্ষিণের টিয়াহুয়ানাকো শহর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিলো। আধুনিক ঐতিহাসিক মীন্‌স এ মতকে সঠিক বলে মনে করেন। তবে অধিকাংশ আধুনিক ঐতিহাসিকরা এ মতকে গ্রহণ করেন না। কারণ, অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, নবম সম্রাট পাচাকুটি যখন সাম্রাজ্য বিস্তার শুরু করেন তখন তিনি কুজকো শহরের কাছাকাছি স্থান থেকেই

দেশ জয়ের কাজ শুরু করেছিলেন। জন রো প্রমুখ আধুনিক ঐতি-হাসিকরা ষোল-সতের শতকের স্পেনীয় ঐতিহাসিক পেড্রো সার-মিয়েণ্টো ডি গামবোয়া এবং বারনাবে কোবো'র বিবরণকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করেন। আমরাও এখানে জন রো'র মতকেই সঠিক বলে গ্রহণ করবো। এ মত অনুসারে, প্রথম আটজন ইনকা সম্রাটের আমলে ইনকাদের রাজনৈতিক আধিপত্য কুজকো উপত্যকার কাছা-কাছি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিলো। কুজকোর চারপাশে তখন ইনকাদের স্বজাতির মানুষই বাস করতো।

মানকো কাপাক ইনকাদের প্রথম সম্রাট। তবে এ নামে সত্যিই কোনো সম্রাট ছিলেন কিনা সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মনে সন্দেহ রয়েছে। দ্বিতীয় ইনকা সম্রাট ছিলেন মানকো কাপাকের ছেলে সিনচি রোকা। তৃতীয় ইনকা সম্রাট হয়েছিলেন সিনচি রোকার দ্বিতীয় পুত্র ল্লকে ইউপানকি। এঁরা দুজনেই ছিলেন নির্বিরোধী মানুষ। ল্লকে ইউপানকির ছেলে মায়তা কাপাক চতুর্থ ইনকা সম্রাট হয়েছিলেন। মায়তা কাপাক ছিলেন রণলিপ্সু সম্রাট। তবে যতদূর মনে হয়, কুজকো শহর থেকে কয়েক মাইল দূর পর্যন্ত তিনি ইনকা সাম্রাজ্যের সীমা বাড়াতে পেরেছিলেন। পরাজিত জাতিগুলোকে কর প্রদান করতে বাধ্য করা হতো।

মায়তা কাপাকের পুত্র কাপাক ইউপানকুই পঞ্চম ইনকা সম্রাট হন। তিনি কুজকো উপত্যকা থেকে বার-চৌদ্দ মাইল দূর পর্যন্ত সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করেন। কাপাক ইউপানকুই-এর পুত্র ইনকা রোকা ষষ্ঠ ইনকা সম্রাট হয়েছিলেন। ইনকা রোকার আমলে ইনকা সম্রাজ্য কুজকোর দক্ষিণে প্রায় কুড়ি মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিলো।

ইনকা রোকার পুত্র ইয়াহুয়ার হুয়াকাক সপ্তম ইনকা সম্রাট হয়েছিলেন। হুয়াকাক-এর পুত্র ভিরাকোচা ইনকা হয়েছিলেন অষ্টম

ইনকা সম্রাট। ইনকা সম্রাটদের মধ্যে ভিরাকোচা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন।

ভিরাকোচা ছিলেন প্রথম ইনকা সম্রাট যিনি বিদেশী জাতি-সমূহের উপর স্থায়ী শাসন আরোপের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর আগেকার সম্রাটরা বিজিত রাজ্যে কোন সেনাবাহিনী বা ইনকা শাসক স্থাপন করতেন না। ভিরাকোচা কুজকোর চারপাশে প্রায় পঁচিশ মাইল পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করেন এবং পুরো এলাকাটাকে একটা অখণ্ড সাম্রাজ্যে পরিণত করেন।

এ সময়ে (১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে) পেরু ও আন্দিজ পর্বত অঞ্চলে আরও কয়েকটি শক্তিশালী রাজ্যের উদয় ঘটেছিলো। কুজকোর দক্ষিণ পূর্বদিকে, কুজকো থেকে অনেকখানি দূরে, টিটিকাকা হ্রদ অঞ্চলে দুটো শক্তিশালী জাতি ছিলো। এরা হলঃ লুপাকা এবং কোলা। এ দুটো জাতের মধ্যে তীব্র শত্রুতা ছিলো এবং প্রত্যেকেই চেষ্টা করছিলো যাতে ইনকাদের সাহায্য নিয়ে অন্য দলকে দমন করা যায়। ইনকা সম্রাট ভিরাকোচা অবশ্য লুপাকাদের সাথে জোট বাঁধেন। এ খবর পেয়ে কোলারা তাড়াতাড়ি লুপাকাদের আক্রমণ করে। কিন্তু যুদ্ধে কোলাদের পরাজয় ঘটে। তবে এ যুদ্ধে দুই পক্ষেরই এত ক্ষতি হয়েছিলো যে ইনকারাই এদের উভয়ের তুলনায় শক্তিমান হয়ে দাঁড়ায়।

কুজকোর পশ্চিমে ছিলো কুয়েচুয়া জাতির বাস। কুয়েচুয়ারা ছিলো জাতিগতভাবে ইনকাদেরই স্বগোত্রীয়। তাদের ভাষা এবং সংস্কৃতিও ছিলো ইনকাদেরই মতো। ইনকাদের সাথে কুয়েচুয়াদের সম্পর্কও ছিলো ভাল। কুয়েচুয়াদের পশ্চিমে থাকতো চানকা জাতি। ভিরাকোচার রাজত্বকালের শুরুতে চানকারা কুয়েচুয়াদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলো। ভিরাকোচার রাজত্বের শেষ দিকে ইনকারা কুজকো

আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে। চানকাদের সৈন্যবল দেখে ভয় পেয়ে ভিরাকোচা কুজকো থেকে দূরে একটা দুর্গে আশ্রয় নেন। কিন্তু ভিরাকোচার এক ছেলে পাচাকুটি ইউপানকুই কুজকো শহরে থেকেই চানকাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ও আশ্চর্যজনকভাবে জয়লাভ করেন। এর পর ভিরাকুচি তার রাজধানী কুজকোতে ফিরে আসেন নি। ভিরাকুচির ইচ্ছা ছিলো তার অন্য এক ছেলেকে সম্রাট করার। কিন্তু পাচাকুটি পিতার আদেশ অমান্য করে নিজেই সিংহাসন অধিকার করেন। পাচাকুটি ইনকা ইউপানকুই হলেন নবম ইনকা সম্রাট। পাচাকুটি ১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট হয়েছিলেন। পাচাকুটির শাসন-কালেই ইনকা সাম্রজ্যের দ্রুত বিস্তার ঘটে। পাচাকুটির ছেলে টোপা ইনকার মৃত্যুকালে, ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে, ইনকা সাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তৃতি ঘটেছিলো। স্পনীয় সেনাপতি পিজারোর আক্রমাণে, ১৫৩৩, খ্রীষ্টাব্দে, ইনকা সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। ১৪৩৮ থেকে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনকা আমলকেই সচরাচর ইনকা রাজত্বের কাল বলে গণ্য করা হয়।

১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ইনকা সাম্রাজ্যের আকস্মিক ও ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ ইতিহাসের এক আশ্চর্যজনক ঘটনা। পাচাকুটির বিজয় অভিযানের মধ্যদিয়ে ইনকা সাম্রাজ্যর বিস্তার সাধনের কাজ শুরু হয়। পাচাকুটি প্রথমে কুজকোর চারপাশের জাতিসমূহকে ইনকা শক্তির অধীনে নিয়ে আসেন। যারা বশ্যতা স্বীকার করতে আপত্তি করে তাদের ধ্বংস করে দেয়া হয়। অল্পকালের মধ্যেই পাচাকুটি কুজকোর উত্তর ও দক্ষিণের দেশগুলো জয় করে নেন। ইনকারা সংখ্যায় খুব বেশি ছিলো না বলে পরাজিত জাতিসমূহ থেকে সৈন্যসংগ্রহ শুরু করে।

পরাজিত জাতিরা যাতে বিদ্রোহ না করতে পারে সে উদ্দেশ্যে ইনকারা এক এক অঞ্চলের সমগ্র অধিবাসীদের উৎখাত করে সাম্রাজ্যের অন্য অংশে সরিয়ে নিতো ; তাদের জায়গায় এনে বসানো হতো অধিকতর বশংবদ প্রজাদের—যারা অনেকদিন ধরে ইনকা শাসনের অধীনে থাকার ফলে স্বাধীনতা স্পৃহা হারিয়ে ফেলেছিলো।

পাচাকুটি এরপর টিটিকাকা হ্রদ অঞ্চলের দিকে দৃষ্টি ফেরান। সেখানে ইনকাদের পুরান প্রতিদ্বন্দ্বী লুপাকা জাতির মানুষরা বিদ্রোহের চেষ্টা করছিলো। সম্রাট পাচাকুটি টিটিকাকা হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম তীরে বসবাসকারী লুপাকা জাতিকে কঠোর হাতে দমন করেন।

পাচাকুটির বয়স বেড়ে গেলে তিনি তাঁর পুত্র টোপা ইনকার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। টোপা ইনকা যুবরাজ অবস্থায়ই অনেক দেশ জয় করেন। পাচাকুটির শেষ অভিযান ছিলো টিটিকাকা হ্রদের তীরবর্তী কোলা জাতির মানুষদের বিরুদ্ধে। এরা মাঝে মাঝেই ইনকাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতো। অবশেষে পাচাকুটি তাঁর অন্য দুই পুত্রের উপর কোলাদের দমনের ভার দিয়ে নিজে কুজকো শহরে বড় বড় প্রাসাদ ও সৌধ নির্মাণের কাজে ব্যাপৃত থাকেন।

যুবরাজ টোপা ইনকা প্রথম অভিযান পরিচালনা করেন সুদূর উত্তর অঞ্চলে। তিনি পেরুর উত্তর অংশের পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে ইকুয়েডর-এর সীমানা পর্যন্ত চলে যান। তখন পেরুর উত্তর অংশে অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতা বা শক্তিশালী রাজ্যের অস্তিত্ব ছিলো না। তবে বর্তমান ইকুয়েডর অঞ্চলে কয়েকটি সুউচ্চ সভ্যতার উদয় ঘটেছিলো, যাদের সভ্যতার মাত্রা ছিলো প্রায় ইনকাদের সমতুল্য। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো কুইটো জাতির সভ্যতা। কুইটোরা থাকতো বর্তমান ইকুয়েডর-এর রাজধানী কুইটো শহরের চারপাশের অঞ্চলে। ঐতিহাসিক লোক-কাহানী এবং সাম্প্রতিক

কালের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের সাক্ষ্য থেকে এ সকল সভ্যতার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা গেছে।

পেরুর উত্তর সীমা এবং কুইটোদের রাজ্যের মধ্যবর্তী অঞ্চলে যে কয়েকটি সুউচচ সভ্যতা ছিলো সেগুলোই প্রথমে ইনকাদের আয়ত্তে আসে। ইনকা বাহিনী দক্ষিণ দিক থেকে অগ্রসর হয়ে পেরুর সীমা অতিক্রম করে প্রথমেই কানারিদের দেশ দখল করে। কানারিরা প্রথমে বীরত্বের সাথে বাধা দিলেও পরে ইনকাদের অনুগত হয়ে পড়ে এবং তাদের দেশ স্থায়ীভাবে ইনকা সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয়। ইনকারা সমস্ত অধিকৃত দেশেই ইনকা রীতির মন্দির, দুর্গ, প্রাসাদ, রাস্তা প্রভৃতি নির্মাণ করতো। কানারিদের দেশকেও ইনকাদের নির্মাণ রীতি অনুযায়ী নতুন করে পুনর্গঠিত করা হয়।

এরপর ইনকারা আরও উত্তরে অগ্রসর হয়ে পানজালিও জাতির দেশের সীমান্তে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখান থেকে কুইটো জাতির রাজার কাছে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে বর্তা পাঠান হয়। এ সহযোগিতার অর্থ অবশ্য ইনকাদের বশ্যতা স্বীকার করা। কিন্তু কুইটো জাতির মানুষ অন্যদের উপর আধিপত্য করাতেই অভ্যস্ত ছিলো, বশ্যতা স্বীকারে নয়। কুইটোরা ইনকাদের আধিপত্য মানতে অস্বীকার করা মাত্র এক তিক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ শুরু হলো। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কুইটোরা পরাজিত হয়।

কুইটোদের সাথে যুদ্ধ চলাকালেই টোপা ইনকা একবার পাহাড় থেকে নীচে মান্‌টা ও হুয়ানকাভিলকা অঞ্চলের উপকূলে নেমে আসেন। এখানে এসে তিনি শুনতে পান যে সমুদ্রের বুকে কতগুলো দ্বীপে অনেক লোকজন ও সোনাদানা আছে; সেখানে পাল তোলা নৌকা নিয়ে বণিকরা যাওয়া আশা করে। এক বিবরণ থেকে জানা যায় যে তিনি নাকি ভেলা ও নলখাগড়ার তৈরি নৌকার

বহর সাজিয়ে অনেক সৈন্য নিয়ে ঐ সব দ্বীপ জয় করেন ও প্রচুর সোনারূপা ও কালো যুদ্ধবন্দী নিয়ে ফিরে আসেন। এ কাহিনীর সত্যতা অবশ্য এখনও প্রমাণিত হয় নি, কারণ দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের কাছাকাছি কোনো দ্বীপে ঐ ধরনের সমৃদ্ধ সভ্যতা বা সংস্কৃতির অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

কুইটো অঞ্চলের পতনের পর পেরু ও ইকুয়েডর অঞ্চলে আর একটা মাত্র স্বতন্ত্র জাতি ইনকা শাসনের বাইরে রয়ে যায়। এরা হলো সুউচচ সভ্যতার অধিকারী চিমু জাতি। চিমুরা পেরুর উত্তর ভাগে সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে বাস করতো। এ প্রাচীন সভ্য জাতির মানুষরা দীর্ঘকাল সুখে স্বাচ্ছন্দে বাস করার ফলে যুদ্ধবিদ্যা প্রায় ভুলে গিয়েছিলো। তাই ইনকাদের রণনিপুণ সৈন্যদের আক্রমণের মুখে চিমুরা সহজেই পরাজিত হয়। বিশেষত চিমুদের রাজ্য থেকে কুজকোর দিকে যে সীমান্ত ছিলো তা শক্তিশালী দুর্গ দিয়ে ঘেরা ছিলো। কিন্তু ইনকারা এক্ষেত্রে কুইটোর দিক থেকে দক্ষিণে অগ্রসর হয়েছিলো বলে চিমুদের রাজ্যে তারা উত্তর দিক থেকে প্রবেশ করেছিলো। অপ্রস্তুত অবস্থায় পাশের দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার ফলে চিমুরা সহজেই পরাজিত হয়। চিমুদের সাথে ইনকাদের যুদ্ধ হয়েছিলো আনুমানিক ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে।

চিমুদের পদানত করার পরে টোপা ইনকা উপকূল ধরে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন। এ উপকূল অঞ্চলে তখন সম্ভবত অনেকগুলো ছোট ছোট স্বতন্ত্র রাজ্য ছিলো। তাদের সকলের উপরে ইনকা শাসন চাপিয়ে দেয়া হয়। এ দফায় ইনকারা বর্তমান লিমা শহর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলো। এর পরে আরেক অভিযানের মাধ্যমে আরও দক্ষিণের নাজকা শহর পর্যন্ত সমগ্র উপকূল অঞ্চল ইনকা সাম্রাজ্যের অধীনে আনা হয়। এ সকল উপকূলীয় জাতিদের ইতিহাস বিশেষ

জানা যায় না। তবে পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে এ অঞ্চলে অনেকগুলো নগর গড়ে উঠেছিলো। পেরুর উপকূল অঞ্চলে প্রত্যেকটি উপত্যকায় এক একটি শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এ সকল শহর যে রাস্তা-ঘাট, বাড়ি-ঘর, পিরামিড, মন্দির, শস্যাগার প্রভৃতি নিয়ে পরিকল্পনা মাফিক নির্মিত হতো, শহরগুলোর ধ্বংসস্তূপ থেকে তার স্বাক্ষর পাওয়া যায়।

ইতোমধ্যে পাচাকুটির শাসন আমলের তেত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। শেষদিকে তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারের ভার ছেলের হাতে দিয়ে নিজে সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন বিষয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন। ১৪৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করে তাঁর ছেলে টোপা ইনকা ইউপানকুইকে সিংহাসনে বসান। এভাবে, ১৪৭১ সালে টোপা ইনকা দশম ইনকা সম্রাট হন।

পাচাকুটি এবং তাঁর ছেলে টোপা ইনকা মিলে আন্দিজ পর্বত ও তার পশ্চিম ঢালের সমস্ত এলাকার ওপর ইনকা আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। তখন আন্দিজ পর্বতের পূর্ব ঢালের অধিবাসীরা ইনকা সীমান্তে মাঝে মাঝে আক্রমণ শুরু করে। আন্দিজের পূর্ব পাশে ব্রাজিল ও বলিভিয়ার বনভূমিতে তখন আদিবাসী উপজাতীয় মানুষ বাস করতো। এ অঞ্চলে তখন পর্যন্ত কোনো উচচ সভ্যতা গড়ে ওঠে নি। এসব বনবাসী উপজাতীয়দের দমন করার জন্য তিনি বিশাল সৈন্যদল নিয়ে অভিযান শুরু করলেন।

বনে-জঙ্গলে পরিচালিত এ অভিযান শেষ হওয়ার আগেই টিটিকাকা হ্রদ অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিল। আয়মারা ভাষাভাষী কোলা এবং লুপাকা জাতি তখন ইনকা শাসনের অধীনে ছিলো। তারা এখন আগেকার শত্রুতা ভুলে অন্যান্য কয়েকটি আয়মারা-ভাষী জাতির সাথে মিলে একজোট হয়ে ইনকা শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

খবর পাওয়া মাত্র টোপা ইনকা বিদ্রোহ দমনের জন্য ফিরে এলেন। ইনকাদের সামরিক সংগঠন কতো শক্তিশালী ও সুনিপুণ ছিলো এ ঘটনা থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক নীচের মালভূমি ও সমভূমি থেকে সৈন্যসামন্ত নিয়ে অতি দ্রুত ১২,০০০ ফুট উচু পর্বত অঞ্চলে ফিরে ইনকা সম্রাট কোলা এবং লুপাকাদের যুদ্ধে পরাজিত করেন।

ইনকা সম্রাটের মধ্যে তখন সাম্রাজ্য বিস্তারের লোভ পুরো মাত্রায় দেখা দেয়। টোপা ইনকা ইউপানকুই তখন তাঁর জানা যতো দেশ ছিলো সবগুলোকে নিজের অধীন আনার জন্য চেষ্টা শুরু করেন। তাঁর পরবর্তী অভিযান পরিচালিত হয় পূর্ব দিকে বলিভিয়া অভিমুখে। বলিভিয়ার উঁচু পার্বত্য অঞ্চলটুকু সহজেই ইনকা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এর পর আসে উত্তর চিলির পালা। একের পর এক অভিযান চালিয়ে চিলির মাঝামাঝি স্থান পর্যন্ত অধিকার করে নেয়। সেখানে বর্তমান কনস্টিটিউসিয়ন শহরের কাছাকাছি স্থানে ইনকা সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ইনকাদের এ দক্ষিণ সীমান্তের দক্ষিণে ছিলো উপজাতীয় আরাউ-কানিয়ানদের বাস।

টোপা ইনকা ততদিনে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। এবার তিনি যুদ্ধ অভিযান বন্ধ করে সাম্রাজ্যকে সুসংগঠিত করার দিকে মনোনি-বেশ করেন। কুজকোতে তিনি এক মস্ত বড় দুর্গ নির্মাণ করেন। তিনিই সম্ভবত সর্বপ্রথম সারা ইনকা সাম্রাজ্যের আদম শুমারীর ব্যবস্থা করেন।

সব ঐতিহাসিকদের মতেই, টোপা ইনকার প্রধান রানী ছিলেন তাঁর আপন বোন মামা ওকলো। ইনকা সম্রাটদের মধ্যে বোনকে

বিয়ে করার প্রথা ছিলো বলে মনে হয়। অনেক ঐতিহাসিকের মতে এর আগেও কোনো কোনো ইনকা সম্রাট তাঁদের বোনকেই প্রধান রানী করতেন। টোপা ইনকার পরবর্তী ইনকা সম্রাটগণ প্রত্যেকেই অবশ্য তাঁদের বোনকেই বিয়ে করে প্রধান রানী করেছিলেন।

টোপা ইনকা ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মারা গেলে হুয়ায়না কাপাক একাদশ ইনকা হন। কিন্তু এত বড় সাম্রাজ্য একজন মানুষের পক্ষে পরিচালনা করা কঠিন ছিলো। কারণ ইনকা সম্রাটরা নিজেদের স্বর্গীয় বলে দাবি করতেন এবং তাঁদের অনুমোদন ছাড়া কোনো একটি কাজও হতে পারতো না। অথচ, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা তখন এত দ্রুত ছিলো না যে আড়াই হাজার মাইল দীর্ঘ সাম্রাজ্যের প্রতিটি স্থানের সাথে সারাক্ষণ সংযোগ রক্ষা করা যায়। এ অবস্থায় বিশাল ইনকা সাম্রাজ্যে ঘন ঘন অসন্তোষ ও বিদ্রোহ ঘটতে থাকে।

হুয়ায়না কাপাক সম্রাট হওয়ার পর কয়েক বছর ধরে সাম্রাজ্যের সব এলাকায় ভ্রমণ করে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। এ রীতি তাঁর পূর্ববর্তী সম্রাটরাও অনুসরণ করেছেন। এরপর হুয়ায়না কাপাক পেরুর উত্তর-পূর্ব অংশের বনাঞ্চলের উপজাতীয় অধিবাসীদের দমন করে তাদের বাসভূমিকে ইনকা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। অতপর তিনি কুজকোয় ফিরে এসে বিশ্রাম নেন এবং পুনরায় দক্ষিণে বলিভিয়া ও চিলির দিকে যাত্রা করেন সে অঞ্চলের অবস্থা দেখার জন্য। এ-সব অঞ্চলের অকর্মণ্য কর্মচারীদের তিনি চাকুরিচ্যুত করেন ও দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করেন। তিনি এ সকল অঞ্চলে রাস্তাঘাট ও নগর নির্মাণের বিষয়েও নির্দেশ দেন।

ইতোমধ্যে কুইটোতে এবং ইকুয়েডর-এর অন্যান্য প্রদেশে বিদ্রোহের সংবাদ এসে পৌঁছায়। হুয়ায়না কাপাক তাঁর দুই

ছেলেকে সাথে নিয়ে সসৈন্যে বিদ্রোহ দমন করতে অগ্রসর হন। দুই ছেলের মধ্যে একজন হলেন আতাহুয়ালপা, যিনি পরে সম্রাট হয়েছিলেন। ইকুয়েডর অঞ্চলের বিদ্রোহ দমন করতে ইনকা সম্রাটকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিলো। বিদ্রোহ দমনের পর হুয়ায়ন কাপাক আনকা সামিও নদী বরাবর চূড়ান্তভাবে সাম্রাজ্যের উত্তর সীমা নির্ধারণ করেন। এ সীমানা এখনও ইকুয়েডর ও কলম্বিয়া রাজ্যের সীমান্ত হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে।

ইকুয়েডর-এর পর্বতের ওপরের অঞ্চলকে দমন ও পুনর্গঠিত করার পর ইনকা সম্রাট উপকূল অঞ্চলের উপজাতীয়দের দমন করতে অগ্রসর হন। ইকুয়েডর-এর পশ্চিম উপকূলে গুয়ায়া উপ-সাগরের তীরে যে সব উপজাতীয় বাস করতো হুয়ায়না কাপাক তাদের পরাস্ত করে তাদের বাসভূমিকে ইনকা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ বিজয়ের মধ্য দিয়ে ইনকা সম্রাটদের সাম্রাজ্য বিস্তার সমাপ্ত হয়। ইনকা সাম্রাজ্য তখন সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করে। ইনকা সাম্রাজ্যের আয়তন সে-সময় দাঁড়ায় ৩ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গমাইল।

উত্তর 'দক্ষিণে এর বিস্তার ছিলো ২৫০০ মাইলের বেশি (৪,০০০ কিলোমিটার)।

হুয়ায়না কাপাক ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে মারা গেলে ইনকা সাম্রাজ্যের অধিকার নিয়ে তাঁর দুই ছেলের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। হুয়ায়না কাপাকের প্রধান রানী ছিলেন তাঁর বোন। এ রানীর ছেলের নাম হুয়াসকার। অন্য এক রানীর ছেলের নাম ছিলো আতাহুয়ালপা। মৃত্যুর কিছুকাল আগে থেকে হুয়ায়না কাপাক কুইটোতে থাকতে শুরু করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আতাহুয়ালপাও কুইটোতে থাকতেন। এক বিবরণ অনুযায়ী হুয়ায়না কাপাক তাঁর সাম্রাজ্যকে দুই ভাগ

করে হুয়াসকারকে কুজকোর সম্রাট করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। হুয়ায়না কাপাক তাঁর কোন্ ছেলেকে নিজের উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত করেছিলেন সে বিষয়েও নিশ্চিতরূপে কিছু জানা যায় না। তবে একথা ঠিক যে হুয়ায়না কাপাকের মৃত্যুর পরে ইনকা সাম্রাজ্যের রাজধানী কুজকোর প্রধান পুরোহিত হুয়াসকারকে সম্রাটরূপে বরণ করে নেন। অন্য দিকে, ইকুয়েডর ও কুইটোর সৈন্যদল ও লোকেরা আতাহুয়ালপাকে সম্রাট বলে মেনে নেয়।

এরপর স্বাভাবিকভাবেই দুই বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মধ্যে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে লড়াই শুরু হলো। হুয়াসকার সৈন্য সামন্ত নিয়ে উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করলেন। আতাহুয়ালপাও সসৈন্যে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলেন। মাঝপথে রাইও বাম্বা নামক স্থানে দুই দলের সাক্ষাৎ হলো। এ ভয়ঙ্কর যুদ্ধে দুই পক্ষের হাজার হাজার সৈন্য মারা গেল। এ যুদ্ধে আতাহুয়ালপা জয় লাভ করলেন। এর পর দুই দলের মধ্যে আরো কয়েকটি যুদ্ধ হলো। সব কটি যুদ্ধেই আতাহুয়ালপা জয়লাভ করলেন। এরপর আতাহুয়ালপা কুইটো থেকে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে কাজামারকা নামক স্থানে এসে শিবির স্থাপন করেন।

হুয়াসকার কুজকো নগরের কিছু উত্তরে শেষবারের মতো শত্রু বাহিনীর সাথে এক যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। এ যুদ্ধে হুয়াসকার পরাজিত ও বন্দী হন। এক বিবরণ অনুসারে, আতাহুয়ালপা হুয়াসকারের সব স্ত্রী পুত্র ও আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করেছিলেন।

স্পেনীয় বিজয়

আতাহুয়ালপার কাছে যখন হুয়াসকারের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ের খবর পৌঁছে তখন প্রায় একই সাথে আরেকটা খবর এসে পৌঁছয়। খবরটা হলো: একদল সাদা মানুষ পেরুর পশ্চিম উপকূলে এসে পৌঁচেছে। এ সাদা মানুষরা হলো ফ্রান্সিসকো পিজারো'র দল। পিজারো ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে পানামা যোজক পার হয়ে প্রশান্ত মহা-সাগরের কূল ধরে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে টামবেজ নামক স্থানের নিকটে এসে তীরে ওঠেন। তাঁর সঙ্গে তখন ছিলো মাত্র ১৮০ জন স্পেনীয় যোদ্ধা। এ যোদ্ধাদের মধ্যে ৬২ জন ছিলো অশ্বারোহী আর ১০৬ জন পদাতিক।

আতাহুয়ালপা ঠিক সময়েই খবর পেয়েছিলেন যে শ্বেতাঙ্গরা এসে পেরুর উপকূলে পৌঁচেছে। তবে তিনি মনে করেছিলেন যে দেবতা ভিরাকোচা বুঝি দলবল নিয়ে ফিরে এসেছেন। ইনকাদের মধ্যে এ প্রবাদ প্রচলিত ছিলো যে তাদের স্রষ্টিকর্তা দেবতা ভিরাকোচা একদা পশ্চিম সমুদ্রের দিকে চলে গিয়েছিলেন এবং অনেকদিন পরে আবার পশ্চিম সমুদ্র থেকে ফিরে আসবেন। ঘোড়ায় চড়া পিজারোর বাহিনীকে তাই আতাহুয়ালপা ভিরাকোচার দল ভেবে ভুল করেছিলেন।

পিজারোর দল যখন পেরুর উপকূল থেকে ইনকা সাম্রাজ্যের ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করছিলো তখন ইনকা সম্রাট আতাহুয়ালপার

দূত এসে তাঁদের আমন্ত্রণ জানালো সম্রাটের সাথে দেখা করার জন্য। পিজারোর দল তখন দূতের সাথে সাথে খাড়া পর্বত বেয়ে উঠলো, আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে, গিরিখাত অতিক্রম করে, দুর্ভেদ্য দুর্গের পাশ দিয়ে অগ্রসর হয়ে, সুদীর্ঘ ঝুলন্ত পুল পার হয়ে অবশেষে কাজামার্কায় এসে ইনকা সম্রাটের সামনে উপস্থিত হলো।

এর পরের ইতিহাস অত্যন্ত চমকপ্রদ। পিজারো প্রথমে কৌশলে ইনকা সম্রাটকে বন্দী করে তারপর অতি দ্রুত সমগ্র ইনকা সাম্রাজ্য জয় করে ফেললেন। মাত্র ১৮০ জন দুর্বিনীত স্পেনীয় সৈন্য কী করে বিশাল ইনকা সাম্রাজ্য অধিকার করতে পারলো সে অবিশ্বাস্য কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় প্রেসকট, হেলপ্‌স ও অন্যান্য ঐতিহাসিকদের গ্রন্থে। বিশেষত ডব্লু. এইচ. প্রেসকট (W.H. Prescott)-এর লেখা 'হিস্ট্রি অফ দি কনকোয়েস্ট অফ পেরু' (১৮৪৭) এবং আর্থার হেলপস্‌ (Arthur Helps)-এর লেখা 'দি স্প্যানিশ কনকোয়েস্ট ইন আমেরিকা' (১৯০১) বই দুটিতে এ ঘটনার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যাবে। পিজারোর বিজয় কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেয়া হলো।

পিজারো আতাহুয়ালপার সাক্ষাৎ লাভ করার আগেই ইনকা সাম্রাজ্যের গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। ইনকা রাজ্যের এ দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণের জন্য সুযোগের সন্ধান করছিলেন পিজারো। ইনকা রাষ্ট্রের গঠন বিন্যাস এমনই ছিলো যে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিলো ইনকা সম্রাটের হাতে। তাই ইনকা সম্রাটকে বশে আনতে পারলেই ইনকা সাম্রাজ্যকেও করায়ত্ত করা সম্ভব হতো। পিজারো ঠিক তাই করেছিলেন। আতাহুয়ালপা তাঁর অপরিমিত ক্ষমতা সম্পর্কে এতই নিশ্চিত ছিলেন যে তিনি অসতর্ক অবস্থায় পিজারোর নিকটবর্তী হওয়া মাত্র পিজারো এক আকস্মিক হামলা

চালিয়ে তাঁকে বন্দী করে ফেলেন। এর ফলে পুরো ইনকা সাম্রাজ্যই পিজারোর হস্তগত হয়ে গেলো। বন্দী আতাহুয়ালপা পিজারোর কথা-মতো যে সব নির্দেশ দিতেন, ইনকা সাম্রাজ্যের মানুষ সে নির্দেশ পালন করতো। তাই বলা চলে যে পিজারো ইনকা সাম্রাজ্য জয় করেন নি, বরং ইনকা সাম্রাজ্যকে বন্দী করেছিলেন।

আতাহুয়ালপা ধনরত্ন প্রদান করে পিজারোর হাত থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করেছিলেন। সোনার জন্য স্পেনীয়দের প্রচণ্ড লোভ আছে জেনে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে পিজারোকে ঘর ভর্তি সোনা দিয়ে দেবেন। যে ঘরে আতাহুয়ালপাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো সেটা লম্বায় ছিলো ২২ ফুট অথবা ৩৫ ফুট আর প্রস্থে ছিলো ১৭ ফুট। সে ঘরের মেঝেয় দাঁড়িয়ে আতাহুয়ালপা যত দূর হাত পেঁছায় তত উঁচুতে একটা দাগ দিলেন। ঐ দাগ বরাবর ঘরের চার দেয়ালে একটা রেখা আঁকা হলো, মেঝে থেকে যার উচ্চতা ছিলো প্রায় ৯ ফুট। আতাহুয়ালপা বললেন, ঐ দাগ পর্যন্ত উঁচু করে সমস্ত ঘরটা সোনায় ভর্তি করে দেয়া হবে এবং আরো দুটো ঘর রূপা দিয়ে ভর্তি করে দেয়া হবে, যদি তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়। পিজারো এ মুক্তি-পণের বিনিময়ে আতাহুয়ালপাকে মুক্তি দিতে রাজি হলেন।

আতাহুয়ালপা তখন সাম্রাজ্যের সর্বত্র নির্দেশ পাঠালেন কাজা-মার্কায় সোনা রূপা পাঠানোর জন্য। আতাহুয়ালপার মনে সন্দেহ ছিলো যে পিজারো হয়তো হুয়াসকারকে ইনকা সম্রাট বানাবেন। তাই বন্দী অবস্থায় থেকেও তিনি গোপন নির্দেশ পাঠিয়ে হুয়াসকারকে হত্যা করান। এদিকে শত শত ল্লামার পিঠে বোঝাই হয়ে প্রভূত পরিমাণ সোনা এসে কাজামার্কায় পেঁছাল। কিন্তু চুক্তি অনুসারে সোনা রূপা পেয়েও পিজারো আতাহুয়ালপাকে মুক্তি দিলেন না।

নানা রকম বানোয়াট অভিযোগে ইনকা সম্রাটের বিচার করে তাকে প্রকাশ্যে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দেয়া হলো। শেষ মুহূর্তে অবশ্য আতাহুয়ালপাকে বলা হলো যে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে তাঁকে অনুগ্রহ করে পুড়িয়ে মারার পরিবর্তে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হবে। আতাহুয়ালপা এতে সম্মত হলে তাঁকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হলো এবং গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হলো। এভাবে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট শেষ ইনকা সম্রাট মারা গেলেন।

এর পরেও কিছুকাল ইনকা অভিজাত শ্রেণী স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইনকা সিংহাসনের শেষ দাবীদার টুপাক আমারু স্পেনীয়দের হাতে নিহত হন। তারপর থেকে সমগ্র ইনকা সাম্রাজ্যে স্পেনীয়দের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইনকা অর্থনীতি ও জীবনযাত্রা

পনের কুড়ি হাজার বছর আগে যে শিকারী মানুষরা দক্ষিণ আমেরিকাতে গিয়েছিলো তারা পশুশিকার করেই জীবন ধারণ করতো। কিন্তু তারপর পেরু অঞ্চলের মানুষ কৃষিকাজ আয়ত্ত করেছে। ইনকা সাম্রাজ্যের আমলে পেরুর মানুষ পশুর মাংস প্রায় খেতোই না। উপকূল অঞ্চলের মানুষ অবশ্য মাছ শিকার করতো। সাধারণভাবে কেউ বনের পশু শিকার করতে পারতো না। তবে, মাঝে মাঝে সমবেতভাবে পশুশিকার করা হতো। দশ বার হাজার মানুষ মিলে সমস্ত বন ঘিরে ফেলে সব পশু ধরতো বা শিকার করতো। তার মধ্যে থেকে কিছু সংখ্যক পশুকে, বিশেষত স্ত্রী জাতীয় পশুদের ছেড়ে দেয়া হতো, যাতে তারা আবার বংশ বৃদ্ধি করতে পারে। বাকি পশুদের হত্যা করে তাদের মাংস শুকিয়ে সব মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হতো। ইতিহাস থেকে জানা যায়, এক একটা প্রদেশকে চার ভাগে ভাগ করা হতো এবং প্রতি চার বছর অন্তর এক একটা ভাগে শিকার করা হতো। সাধারণ হরিণ, গুয়ানাকো, ভিকুনা প্রভৃতি প্রাণী শিকার করা হতো।

ইনকা আমলে পেরুর অর্থনীতি প্রধানত কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল ছিলো। ইনকা রাজ্যের লোকেরা প্রধানত নিরামিষভোজী ছিলো। গোলআলু ছিলো ইনকাদের প্রধান খাদ্যশস্য। ইনকারা

ভূট্টা, নানা ধরনের সীম, মিষ্টি আলু, টমাটো, লাউ, কাঁচা মরিচ ইত্যাদির চাষ করতো। এগুলোর মধ্যে একমাত্র লাউ ছাড়া অন্য সব তরি-তরকারী এবং খাদ্যশস্য ইউরোপ, আফ্রিকা বা এশিয়ায় অপরিচিত ছিলো। স্পেনীয়রা এবং পর্তুগীজরা এ সকল খাদ্যশস্য ও তরি-তরকারী ইউরোপ এশিয়ায় প্রচলন করেছিলো।

১৪,০০০ ফুট উপরের উপত্যকায় আলু এবং অন্য কয়েকটি ফসল উৎপন্ন হতো। উঁচু পাহাড়ের উপরের মানুষ প্রধানত আলু খেয়ে প্রাণ ধারণ করতো। ১১,০০০ ফুট পর্যন্ত উচচতায় ভূট্টা উৎপন্ন হতো। পার্বত্য অঞ্চলের মাঝারি উচচতার মানুষদের জন্য ভূট্টাই ছিলো প্রধান খাদ্যশস্য। পাহাড়ের নীচের অঞ্চলের মানুষরা আলু, ভূট্টা ও অন্যান্য তরি-তরকারী খেতো। পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে কেটে তাতে চাষ করা হতো।

ইনকারা লাঙলের ব্যবহার জানতো না। তবে পশু পালনের কৌশল জানতো। লামা ও আলপাকাকে তারা পোষ মানিয়েছিলো। কিন্তু এ সব ছোট ছোট পশু দিয়ে হাল চাষ করা সম্ভব ছিলো না। তা ছাড়া লাঙল জিনিসটাই ছিলো তাদের অজানা। ইনকারা শক্ত কাঠের কোদাল দিয়ে মাটি কোপাত, এ কোদালের নাম ছিলো টাক্লা। পুরুষরা এ কোদাল দিয়ে জমি চাষ করতো। মেয়েরা এক ধরনের গদা দিয়ে শক্ত মাটি ভেঙে চাষের কাজে সহায়তা করতো। একটা লাঠির আগায় পাথরের চাকতি বসিয়ে এ গদা তৈরি করা হতো। প্রত্যেক পরিবারকে এক ফালি লম্বা জমি দেয়া হতো। স্বামী স্ত্রী মিলে খেতে কাজ করতো। বর্ষাকালে ফসল বোনার সময় সামাজিকভাবে আমোদ আহ্লাদ উৎসব করতো। ইনকা সাম্রাজ্য দক্ষিণ গোলার্ধে ছিলো বলে সেখানে বর্ষা হতো ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে। ভূট্টা বোনা হতো আগস্ট মাসে, আলু ডিসেম্বরে। ফসল

উঠতো জানুয়ারি থেকে জুলাইয়ের মধ্যে। ফসল তোলার সময়ে নাচ গান ও আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। ক্ষেতে কাজ করার সময়েও ছেলে ও মেয়েরা গান গেয়ে গেয়ে কাজ করতো। ফসল ওঠার পরে ভূট্টাকে ঝেড়ে শুকিয়ে ঘরে ঘরে জমা করে রাখা হতো। আর আলুকে পা দিয়ে মাড়িয়ে গুঁড়ো করে রোদে শুকিয়ে জমা করে রাখা হতো। টিটিকাকা হ্রদের ধারের লোকেরা মাছ ধরে খেতো। এরা মাছ ধরার জন্য নানা ধরনের জাল এবং কোচ বা বল্লম ব্যবহার করতো। কিন্তু তারা বঁড়শি বা ছিপের ব্যবহার জানতো না। সমুদ্রের উপকূলের মানুষরাও মাছ ধরতো। এরা অবশ্য মাছ ধরার জন্য নানা ধরনের যন্ত্রপতি ও কৌশল ব্যবহার করতো।

পেরু অঞ্চলে চাররকম উট বংশের প্রাণী ছিলো। এরা: ল্লামা, আলপাকা, ভিকুনা এবং গুয়ানাকো। প্রথম দুটো প্রাণী আকারে সামান্য বড় এবং এগুলোকে পেরুর মানুষ পোষ মানাতে পেরেছিলো। ভিকুনা আর গুয়ানোকো ছিলো আকারে ছোট এবং বন্য প্রাণী। ল্লামা এবং আলপাকাও অবশ্য উটের তুলনায় খুবই ছোট। ল্লামাকে ভারবাহী পশু হিসেবে ব্যবহার করা হতো। আলপাকাকে পোষা হতো তার লোমের জন্য। আলপাকার লোম সাধারণত গাঢ় বাদামী বা কালো রঙের হতো। এ লোম দিয়ে গরম কাপড় তৈরি করা হতো।

ল্লামারা পানি না খেয়ে দীর্ঘ পথ চলতে পারতো আর তারা কষ্ট সহিষ্ণুও ছিলো। তাই ভারবাহী পশু হিসেবে ল্লামারা খুবই উপযোগী ছিলো। তবে, তারা এক বা দেড় মণের বেশি ওজন বহন করতে পারতো না। ল্লামারা ঘোড়ার মত দ্রুত চলতে পারতো না। ইনকারা তাই মাল পরিবহণের জন্য শত শত ল্লামার পিঠে মালপত্র চাপিয়ে তাদের সারি বেঁধে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠাতো। প্রতি

শত লামার জন্য প্রায় ৮ জন চালক দরকার হতো। লামার দল দিনে প্রায় ১০ থেকে ১২ মাইল যেতে পারতো। ইনকা সাম্রাজ্যে দেশের সব লামা ও আলপাকা প্রধানত রাজার সম্পত্তি ছিলো।

ইনকারা লামা ও আলপাকা ছাড়াও কুকুর, গিনিপিগ এবং হাঁস পুষতো। মানুষ যখন প্রথম বেরিং প্রণালী পার হয়ে আমেরিকা মহাদেশে গিয়েছিলো তখন সাথে করে কুকুরও নিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু হাঁস ও গিনিপিগকে পেরুর মানুষই প্রথম পোষ মানিয়েছিলো। সাধারণ ইনকারা প্রধানত গিনিপিগের মাংসই খেতো।

ইনকাদের রান্নার কৌশল খুব উন্নত ছিলো না। কাঠে কাঠ ঘষে আগুন জ্বালানো হতো। একটা কাঠের গায়ে গর্ত করে তাতে একটা কাঠিকে দড়ি পাকানোর মতো কৌশলে দুই হাতে ঘোরানো হতো। এ ভাবে আগুন জ্বালানোর কৌশল আমাজন অঞ্চলের জঙ্গলের বন্য মানুষরাও জানতো। মেক্সিকোর মানুষরা যেমন ভূট্টাকে সিদ্ধ করে তারপর সেটাকে পিষে নিতো, ইনকারা সেভাবে ভূট্টা খেতো না। ইনকারাও শুকনো ভূট্টাকে গুড়ো করে ভূট্টার আটা বানিয়ে নিতো। সাধারণত একটা পাথরের পাটার উপরে অর্ধ গোলাকার পাথরের টুকরো দিয়ে ঘষে ঘষে ভূট্টা গুঁড়ো করা হতো। ইনকারা আস্ত ভূট্টাকে পুড়িয়ে বা সিদ্ধ করেও খেত। ইনকারা খামির-এর ব্যবহার জানতো না। তাই তারা তন্দুর রুটি বা পাউরুটীর মতো রুটি বানাতে পারতো না। ইনকারা আলুকে বরফে জমিয়ে তারপর আবার বরফ মুক্ত করে সেটাকে টিপে টিপে রস বের করে নিতো। তারপর আলুকে শুকিয়ে জমা করে রাখতো। ইনকারা মাছ এবং মাংস কেটে জমা করে রাখতো। তারা ভূট্টা প্রভৃতি শুকনো শস্যকে বাড়িতে অথবা গোলায় জমা করে রাখতো।

ইনকারা মাটির পাত্রে রান্না করতো। তারা খাওয়া দাওয়ার জন্যও মাটির পাত্রই ব্যবহার করতো। তবে লাউয়ের খোল, কাঠের পাত্র

প্রভৃতির প্রচলনও ছিলো। ধনী ও অভিজাত ইনকারা সোনা রূপার পাত্রও ব্যবহার করতো। রান্নার কাজ সাধারণত ঘরের বাইরেই করা হতো, তবে অনেক বাড়িতেই রান্নার স্থায়ী চুলা ছিলো। ইনকা রাজ্যের লোকেরা সাধারণত দিনে দুবার পেট ভরে খেতো — সকালে ও সন্ধ্যায়।

ইনকারা পশম ও সূতীর পোষাক পরতো। তারা তাঁতে তৈরি বা হাতে বোনা কাপড় পরতো। তবে তারা কাপড় কেটে সেলাই করে পোষাক তৈরি করার কৌশল জানতো না। তারা আস্ত কাপড়ের টুকরোকে ভাঁজ করে কোমরের নীচে পরতো। আরেকটা কাপড়কে দু ভাঁজ করে গায়ে দিতো। তাতে মাথা এবং হাত বের করার জায়গা বাদ রেখে বাকি অংশ সেলাই করা হতো অথবা সোনা, রূপা বা তামার পিন দিয়ে আটকে রাখা হতো। ইনকারা লামার চামড়া দিয়ে তৈরি স্যাণ্ডেল পরতো।

ইনকা মহিলারা যে পোষাক পরতেন সেটা লম্বা একখণ্ড কাপড় দিয়ে তৈরি হতো। এ কাপড়টি কাঁধ থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত সমস্ত শরীরটাকেই আবৃত করতো। মেয়েরাও পুরুষদের মতো চামড়ার স্যাণ্ডেল পরতো। মেয়েরা চুল কাটতো না বরং লম্বা চুল রাখতো, তাঁরা মাথার মাঝখানে সিঁথি করতো। পুরুষরা চুল কাটতো — সামনের দিকে ছোট করে, পিছনের দিকে একটু লম্বা রেখে। ইনকা মহিলারা গলায় হার পরতো। অভিজাত ইনকা পুরুষরা কানে গয়না পরতো।

ইনকাদের রাষ্ট্র ও সমাজ

ইনকা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ এবং একমাত্র শাসক ছিলেন ইনকা সম্রাট। সূর্য-দেবের বংশধর হিসেবে ইনকা সম্রাটরা ঐশ্বরিক অধিকার লাভ করেছিলেন। ইনকা সম্রাটকেও দেবতা হিসেবেই পূজা ও মান্য করা হতো। সম্রাটের একাধিক পত্নী ও উপপত্নী থাকতো। তাই সব সম্রাটেরই বহু সংখ্যক ছেলেমেয়ে থাকতো। সম্রাটের আত্মীয়-স্বজন ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে অভিজাত শ্রেণী গঠিত হয়েছিলো। এ অভিজাতদের মধ্য থেকেই রাষ্ট্রের উঁচু পদসমূহের জন্য রাজ কর্মচারী নির্বাচন করা হতো।

সম্রাটের ছেলেই সম্রাট হতো। সাধারণত প্রধান রাণীর ছেলেদের মধ্যে যে সবচেয়ে উপযুক্ত তাকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করা হতো। একজন সম্রাট বার্ধক্যে উপনীত হলে, অথবা মৃত্যুকালে পরবর্তী উত্তরাধিকারীর নাম মনোনয়ন করতেন। প্রত্যেক সম্রাট নিজের জন্য একটা করে প্রাসাদ নির্মাণ করতেন। সম্রাটের মৃত্যুর পর ঐ প্রাসাদ তাঁর স্মৃতিসৌধরূপে গণ্য হতো। সম্রাটের মৃত্যুর পর সমস্ত সাম্রাজ্যে তাঁর জন্য শোক অনুষ্ঠান করা হতো। মৃত সম্রাটের দেহটিকে মমিতে পরিণত করে রক্ষা করা হতো। স্পেনীয়রা ইনকা সাম্রাজ্য অধিকার করার পর সমস্ত ইনকা সম্রাটদের দেহের মমি দেখতে পেয়েছিলো।

সম্রাটের মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত পত্নী ও ভৃত্যেরা স্বেচ্ছায় মৃত্যু-বরণ করে সম্রাটের অনুগমন করে পরলোকে যাবে এমনটাই সকলে আশা করতো। সম্রাটের মৃত্যুর পরে এরা সকলে মদ্য পান করে মস্ত এক নাচ-সভায় মাতাল হয়ে নাচতো এবং তখন তাদের গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হতো।

পবিত্র সম্রাটের সামনে উচ্চপদস্থ অভিজাত রাজকর্মচারীরাই কেবল যেতে পারতো। সাধারণত সম্রাটের সাক্ষাৎ কেউ পেত না, পর্দার অন্তরালে থেকেই সম্রাট তাঁদের সাথে কথা বলতেন। দুই একজন অতি সৌভাগ্যবান ব্যক্তিই সম্রাটের মুখোমুখি হতে পারতো। সম্রাট যখন সাম্রাজ্য পরিদর্শনে বের হতেন তখন লোকলস্কর ছাড়াও তাঁর পাল্কী বহন করার জন্যই কয়েকশ মানুষ থাকতো। এত লোকজন নিয়ে এবং সম্রাটের উপযুক্ত ধীরগতিতে চলার ফলে ভ্রমণকালে সম্রাটের বাহিনীর চলার গতি দিনে বারো তেরো মাইলের বেশি হতো না।

রাজপ্রাসাদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাজ করার জন্য ভৃত্য সংগ্রহ করা হতো বিভিন্ন গ্রাম থেকে। ঐসব গ্রাম থেকে খাজনা হিসেবে এ সকল লোক সংগ্রহ করা হতো। এ সকল ভৃত্য যদি কোনো অপরাধ করতো তবে তার পুরো গ্রামকেই শাস্তি ভোগ করতে হতো। যদি কোনো ভৃত্য সম্রাটের ক্ষতি সাধন করতো তবে তার গ্রামটাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হতো।

সম্রাটের সিংহাসন বলতে ছিলো আট ইঞ্চি উঁচু একটা কাঠের পিঁড়ি বা জলচৌকি। এ আসনটিকে একটা উঁচু বেদীর উপর রাখা হতো। কারো কারো মতে রাজার সিংহাসনটি ছিলো সোনার তৈরি। ইনকা সম্রাটরা সোনার বাসনে আহার করতেন। কিন্তু ইনকা সম্রাটের শোয়ার জন্য কোনো খাট চৌকির ব্যবস্থা ছিলো না। মাটিতে একটা কাথার উপর একটা পশমের কম্বল বিছিয়ে তার উপর ইনকা সম্রাট ঘুমাতেন।

১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দের পর ইনকা রাষ্ট্র যখন একটা ক্ষুদ্র রাজ্য থেকে বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয় তখন অজস্র ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও রাজ্যকে বশীভূত ও সংগঠিত করার সমস্যা দেখা দেয়। যেসব ছোট ছোট জাতি ইনকাদের বশ্যতা স্বীকার করে তাদের রাজাকে তাদের দেশে ক্ষমতায় রেখে তাদের ছেলেদের কুজকোতে নিয়ে আসা হয় ইনকা রীতিনীতি শিক্ষা দেয়ার জন্য। রাজপুরুষদের ছেলেদের শিক্ষাদানের জন্য কুজকোতে একটা বিদ্যালয় ছিলো। এখানে চার বছর ধরে শিক্ষা দেওয়া হতো। প্রথম বছরে ইনকা ভাষা, দ্বিতীয় বছরে ইনকা ধর্ম, তৃতীয় বছরে 'কিপু' ব্যবহারের কৌশল, এবং চতুর্থ বছরে ইনকা ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হতো।

ইনকা সাম্রাজ্যের পরিধি বেড়ে গেলে আগেকার ক্ষুদ্র অভিজাত শ্রেণী দিয়ে রাজ্য পরিচালনা আর সম্ভব ছিলো না। সম্রাট পাচাকুটি তাই কুজকোর নিকটবর্তী ইনকা ভাষাভাষী কতগুলো গোষ্ঠীকে ইনকা অভিজাত বলে স্বীকৃতি দেন। এ সব অভিজাত রাজ কর্মচারী হিসেবে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নতুন দেশগুলো শাসন করতেন।

সম্রাট ও অভিজাত শ্রেণী নানারকম সুবিধা ভোগ করতেন। অভিজাতরা সম্রাটের মতো পাল্কি, পোষাক, চাকরবাকর, বিলাসদ্রব্য ব্যবহার করতে পারতেন, হারেম রাখতে পারতেন। অভিজাতরা সব-রকম খাজনা থেকে রেহাই পেতেন এবং সরকারী খরচে জীবনযাপন করতেন। অভিজাতদের ল্লামা ও জমি প্রদান করা হতো। পুরোহিতরাও ছিলো সুবিধাভোগী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

ইনকা সাম্রাজ্যের ধনী দরিদ্রের ভেদ ছিলো, কিন্তু প্রাচীন মিশর বা ব্যাবিলনের মতো সেখানে দাস শ্রেণী ছিলো না। দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর উৎপাদিত সম্পদের উপর নির্ভর করে টিকে ছিলো অভিজাত ও পুরো-হিত শ্রেণী। ইনকাদের রাজ্যে দাস অবশ্য ছিলো। কিন্তু দাসশ্রেণীর

শ্রমের উপর সমাজ নির্ভর করতো না। সমাজ নির্ভর করত স্বাধীন কৃষকদের শ্রমের উপর। স্বাধীন কৃষকদের স্বাধীনতা অবশ্য প্রায় ছিলোই না। তথাপি তাদের দাস বলা চলে না।

ইনকা আমলের আগে পেরুতে উপজাতীয়দের ধরনের গোষ্ঠীই ছিলো সমাজের ভিত্তি। ক্রমশ পেরু অঞ্চলে ছোট ছোট রাজ্যের উদয় হলে গোষ্ঠির উপর রাজাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনকা সাম্রাজ্যের আমলে গোষ্ঠি বা স্থানীয় রাজার প্রতি আনুগত্যের বদলে দূর অঞ্চলের ইনকা সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের উদয় ঘটে। গোষ্ঠির চেতনার সাথে এভাবে রাজতন্ত্রের চেতনা মিশে যায়।

ইনকা আমলে এক এক এলাকার কতগুলো গোষ্ঠিকে একত্রিত করে একটা অঞ্চল গঠন করা হতো। কয়েকটা অঞ্চল নিয়ে একটা প্রদেশ গঠন করা হতো। সমগ্র সাম্রাজ্যকে চারটে খণ্ডে ভাগ করা হয়েছিলো। কুজকোর উত্তর পশ্চিম, দক্ষিণ পশ্চিম, উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব অংশে ছিলো এ চারটি খণ্ড। প্রত্যেক খণ্ডে ছিলো অনেক-গুলো করে প্রদেশ।

প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে ইনকা প্রশাসক থাকতেন। সাম্রাজ্যের চারটি খণ্ডের জন্য চারজন শাসক ছিলেন। এঁরা কুজকোতে থেকে এক রাষ্ট্র পরিষদ গঠন করতেন। এ পরিষদ তার মতামত ও পরামর্শ সম্রাটকে জানাতেন। সম্রাটের সিদ্ধান্ত এবং নির্দেশই অবশ্য চূড়ান্ত ছিলো।

প্রাদেশিক শাসকদের অধীনে নানা স্তরের কর্মচারী ছিলো। কৃষকদের ও করদাতাদের উপর তদারকি করাই ছিলো তাদের কাজ। সবচেয়ে নীচের পর্যায়ের কর্মচারীরা প্রত্যেকে দশজন বা পঞ্চাশজন লোকের হিসেব রাখতো। তার উপরের কর্মচারী একশ জনের হিসেব রাখতো। তার উপরের জন এক হাজারজনের

দায়িত্বে ছিলো। তার উপরের কর্মচারী দশ হাজার লোকের হিসেব রাখতো। এদের উপরে ছিলেন প্রাদেশিক শাসক। ইনকা সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা ধাপে ধাপে এমনভাবে বিন্যস্ত ছিলো যে সাম্রাজ্যের প্রতিটি লোকের হিসেব কর্তৃপক্ষের নখদর্পণে থাকতো। ইনকা শাসকরা দশের হিসেবে লোক গুণত। যেমন দশ, একশ, হাজার, দশ হাজারজনের দলের হিসেব। কিপুর সাহায্যে এসব হিসেব রাখা হতো। প্রতিটি প্রদেশের প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি লোকের জন্ম, মৃত্যু ও বয়স অনুযায়ী কর্মক্ষমতার হিসেব কিপুর সুতায় গিঁট বেঁধে লিখে রাখা হতো। প্রতিটি লোকের কাছ থেকে হিসেব অনুযায়ী কাজ ও খাজনা আদায় করা হতো।

রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

পেরু অঞ্চলে ইনকাদের আগেও হয়তো রাস্তাঘাট তৈরী হতো তবে ইনকা আমলেই এ অঞ্চলে উৎকৃষ্ট রাস্তা নির্মিত হয়েছিলো। আসিরীয়, পারসিক বা রোমানদের মতো ইনকাদেরও বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র সৈন্য, রসদ ও সংবাদ পাঠানোর জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণের প্রয়োজন হয়েছিলো। অবশ্য আসিরীয় বা রোমানদের যেমন ঘোড়ার গাড়ি বা যুদ্ধরথ ছিলো, ইনকাদের তেমন কোনো চাকাওয়ালা গাড়িই ছিলো না। তাই ইনকাদের চওড়া রাস্তা বা অত্যন্ত মজবুত পুলের প্রয়োজন ছিলো না। আবার পাহাড়ের খাড়া অঞ্চলে তারা ধাপ কেটে পথ তৈরি করতে পারতো।

ইনকা সাম্রাজ্যে উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বি দুটো প্রধান সড়ক ছিলো। একটা নীচের উপকূল ধরে, আরেকটা পর্বতের উপর দিয়ে। অনেকগুলো আড়াআড়ি রাস্তা এ দুটো প্রধান সড়ককে সংযুক্ত করেছিলো। আর ছোটখাট অনেক রাস্তা ইনকা সাম্রাজ্যের প্রতিটি গ্রামে গিয়ে পেঁৗছেছিলো। উপকূল অঞ্চলের মহাসড়কটি টামবেজ থেকে শুরু হয়ে উপকূল ধরে আরেকুইপা পর্যন্ত গিয়েছিলো এবং শেষ পর্যন্ত সম্ভবত চিলি পর্যন্ত গিয়ে পেঁৗছেছিলো। তবে আরেকুইপা থেকে চিলি পর্যন্ত রাস্তাটা খুব বেশি ব্যবহার করা হতো না। পর্বতের উপর দিয়ে যে রাস্তাটা গিয়েছিল সেটা ছিল আরও দীর্ঘ। এ মহাসড়কটি

শুরু হয়েছিলো কলম্বিয়ার দক্ষিণ সীমান্ত থেকে এবং দক্ষিণে এটা চলে গিয়েছিলো কুজকো পর্যন্ত। কুজকো থেকে এটা আরো দক্ষিণে চলে যায়। টিটিকাকা হ্রদের কাছে এসে রাস্তাটা দুভাগ হয়ে দক্ষিণে অগ্রসর হয়। টিটিকাকার দক্ষিণ থেকে রাস্তাটা দক্ষিণ পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বর্তমান আর্জেন্টিনার অন্তর্গত টুকুমান-এ গিয়ে পেঁছায়। সেখান থেকে একটা রাস্তা চলে যায় চিলির উপকূলের কোকুইম্বো নামক স্থানে এবং সেখান থেকে আরো দক্ষিণে সাণ্টিয়াগোতে। আরেকটা রাস্তা টুকুমান থেকে আর্জেণ্টিনার মেনডোজা পর্যন্ত চলে যায়। পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত একটা আড়াআড়ি রাস্তা উপকূলীয় নগর টামবেজকে পর্বতের উপরের রাস্তার সাথে যুক্ত করেছিলো। অন্যান্য মহাসড়ক কুজকোর সাথে আরেকুইপা, নাজকা প্রভৃতি স্থানের সরাসরি সংযোগ স্থাপন করেছিলো।

পাহাড়ের উপর দিয়ে যে সব রাস্তা তৈরি হয়েছিলো সেগুলো নির্মাণ করতে যথেষ্ট পরিমাণ কারিগরি নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়েছিলো। রাস্তা-গুলো যথাসম্ভব সরলরেখা বরাবর তৈরি করা হতো কিন্তু পর্বতের ঢাল অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রেই আঁকাবাঁকা রাস্তা তৈরি করতে হয়েছিলো। আবার পথ যেখানে খাড়া নেমে গেছে সেখানে পাথরের গায়ে সিড়ির মতো ধাপ কেটেও পথ নির্মাণ করা হয়েছে। রাস্তাগুলো ছিলো প্রায় ৩ ফুট চওড়া এবং পাথর দিয়ে বাঁধানো। জলাভূমির উপর দিয়ে পথ গেলে সেখানে বাঁধ তৈরি করে বাঁধের উপর দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে, নদীর উপর পুল নির্মাণ করা হয়েছে এবং পাহাড়ের ভিতর দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে।

উপকূল অঞ্চলের রাস্তা অবশ্য সোজা ও চওড়া হতো। এ সব রাস্তা সাধারণত ১২ থেকে ১৫ ফুট চওড়া হতো। মরুভূমি দিয়ে যে সব রাস্তা গিয়েছিলো সেখানে রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধ থাম পুঁতে পথ নির্দেশ

করা হতো। গ্রাম বা শহরের মধ্য দিয়ে রাস্তা গেলে পথের দু'পাশে দেওয়াল তুলে দেওয়া হতো।

ইনকাদের মহাসড়কের পাশে কিছু দূর অন্তর একটা করে বিশ্রামঘর থাকতো। সরকারী প্রয়োজনে যাঁরা এ পথ দিয়ে যেতেন তাঁরা এ সকল ঘরে বিশ্রাম নিতেন। সাধারণত একদিনের ভ্রমণের দূরত্বে এ সকল বিশ্রাম ঘর নির্মাণ করা হতো। এ ছাড়া রাস্তার উপর যে সব শহর ছিলো তাতে সম্রাটের জন্য 'রাজকীয় বিশ্রামঘর' নির্মাণ করা হতো। সম্রাট যদি কখনও এ পথ দিয়ে যেতেন তাহলেই শুধু এ সব রাজকীয় বিশ্রামঘর ব্যবহার করা হতো। কিন্তু সম্রাট কোন শুভদিনে আসবেন তার প্রতীক্ষায় এ সকল রাজকীয় বিশ্রামঘরকে সর্বক্ষণ নিখুঁতভাবে প্রস্তুত রাখা হতো। সব রকম বিশ্রাম ঘরেই সর্বদা খাদ্য দ্রব্য ও আসবাবপত্র মজুত রাখা হতো।

নদী পার হওয়ার জন্য নানা ধরনের পুল তৈরি করা হতো। ছোট নদীর উপর দিয়ে লম্বা লম্বা কাঠের গুঁড়ি বা পাথর পেতে পুল তৈরি করা হতো। নদীর মধ্য দিয়ে পাথরের থাম নির্মাণ করা হতো; কাঠের বা পাথরের পাটাতনগুলো এ সব থামের উপর ভর দিয়ে থাকতো। বড় বড় নদীর উপর দিয়ে তৈরি হতো ভাসমান পুল। ছোট ছোট নৌকা বা ভেলার উপর ভর দিয়ে এ সমস্ত পুল দাঁড়িয়ে থাকতো। তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ ছিলো ঝুলন্ত পুল। ঝুলন্ত পুল নির্মাণের জন্য খড় বা লতার তৈরি মোটা মোটা ৬টা দড়ি টানা দেয়া হতো নদীর উপর দিয়ে। চারটে দড়ি নীচে বিছানো হতো হেঁটে পার হওয়ার জন্য। দুটো দড়ি টানা দেয়া হতো হাতল হিসেবে।

এ মোটা দড়িগুলো ছিলো প্রায় ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের। এ দড়িগুলো তৈরি করা হতো খড়, গাছের ছাল, লতা এবং নরম শাখা প্রশাখা দিয়ে। যে চারটে দড়ি দিয়ে পুলের মেঝে তৈরি হতো তাদের উপর

আড়াআড়িভাবে কাঠের লাঠি বা ডাল স্থাপন করা হতো এবং মাটি দিয়ে লেপে দেওয়া হতো। হাতলের দড়ির সাথে পুলের মেঝেকে ছোট ছোট দড়ি দিয়ে যুক্ত করা হতো। এ ধরনের পুল দিয়ে পঁচিশ ত্রিশ জন মানুষ এক সাথে পার হতে পারতো, লামার দলও যেতে পারতো। এ পুলগুলো বাতাসে অনবরত দুলত ঠিকই, কিন্তু নিরাপদও ছিলো। পুলের কাছাকাছি এলাকার লোকদের উপর দায়িত্ব ছিলো প্রতি বছর পুল-গুলিকে মেরামত করা। এ পুলগুলো ২০০ ফুট বা তার বেশি লম্বাও হতো।

পেরুতে বা ইনকা রাজ্যে চাকাওয়ালা গাড়ি ছিলো না। মালপত্র সাধারণত মানুষের বা লামার পিঠে করে বহন করা হতো। সাধারণ মানুষ পায়ে হেঁটে চলতো। ধনী ও অভিজাত মানুষরা পাল্কি চেপে চলাফেরা করতেন। সম্রাটের পাল্কি ছিল সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ। সম্রাট যখন সাম্রাজ্য পরিদর্শনে বের হতেন তখন তাঁর পাল্কি বহন করতো সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় অভিজাত ও সামন্তরা।

ইনকা রাজ্যের রাস্তা দিয়ে সচরাচর সৈন্যদল, রাজকর্মচারী এবং মালবাহী লামার দল যাতায়াত করতো। তা ছাড়াও, খবর বা হাল্কা জিনিসপত্র পাঠানোর জন্য এক ধরনের ডাক ব্যবস্থা দিন রাত কাজ করতো। প্রায় এক মাইল অন্তর অন্তর রাস্তার দুই পাশে এক জোড়া ঘর তৈরি করা ছিলো। এগুলো ছিল ডাকঘর। প্রত্যেক ঘরে দু'জন করে লোক দিনরাত উপস্থিত থাকতো। এদের একজন সারাক্ষণ রাস্তার দিকে চেয়ে থাকতো। যখনই দূর থেকে একজন ডাক হরকরাকে আসতে দেখা যেত তখনই ঘরে অপেক্ষমান লোকটি ছুটে বের হয়ে গিয়ে ছুটন্ত হরকরার সাথে দৌড়াতে দৌড়াতে তার কাছ থেকে মৌখিক খবর বা কিপু প্রভৃতি সংগ্রহ করতো। তারপর সে খবর নিয়ে খুব জোরে দৌড়ে গিয়ে পরবর্তী ডাকঘরের লোকের হাতে তুলে

দিতো। যে হরকরা সংবাদ নিয়ে এসেছিলো তাকে বিশ্রাম করার সুযোগ দিয়ে ডাকঘরে অন্য একজন লোককে পরবর্তী খবর বহন করার জন্য বসিয়ে রাখা হতো। এ কাজের জন্য যুবকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়োগ করা হতো। এক এক এলাকার যুবকরা পালাক্রমে ১৫ দিনের জন্য বেগার খেটে এ দায়িত্ব পালন করতো।

এ ডাক ব্যবস্থার মাধ্যমে অতি দ্রুত গতিতে সংবাদ প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছিলো। লিমা থেকে কুজকো পর্যন্ত প্রায় ৪২০ মাইল দূরত্বে সংবাদ নিয়ে যেতে সময় লাগতো মাত্র তিনদিন। এ ছাড়া প্রয়োজন বোধে ইনকারা মশালের আগুন বা ধোঁয়ার সাহায্যে সংকেতের মাধ্যমে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সংবাদ প্রেরণ করতো।

জলপথে চলাচলের জন্য ইনকারা নৌকা ব্যবহার করতো। উপকূল অঞ্চলে এবং টিটিকাকা হ্রদে এ সব নৌকায় চড়ে জেলেরা মাছ ধরতো। নলখাগড়া দিয়ে তৈরি এসব নৌকাকে বলা হতো 'বালসা'। সাধারণত একজন মানুষ এ নৌকায় চড়তে পারতো। পেরু ও ইকুয়েডর-এর উপকূল অঞ্চলে যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হতো সেখানে বনভূমি গড়ে উঠেছিলো। এ অঞ্চলে কাঠের গুঁড়ি জোড়া দিয়ে নৌকা তৈরি করা হতো। এ রকম নৌকায় পঞ্চাশজন মানুষ চড়তে পারতো। এ সব কাঠের তৈরি নৌকায় পাল থাকতো, বৈঠাও ব্যবহার করা হতো। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে প্রাচীন কালে এ ধরনের নৌকায় করে পেরু অঞ্চলের মানুষ ইন্দোনেশিয়া বা এশিয়া পর্যন্ত যাওয়া আসা করতো।

ইনকাদের ধর্ম

ইনকারা সূর্যের পূজা করতো। ইনকা সম্রাটরা নিজেদের সূর্যের সন্তান বলে দাবী করতেন। ইনকারা চাঁদকেও দেবী বলে গণ্য করতেন। চাঁদ ছিলো সূর্যের পত্নী। ইনকারা আরো অনেক জিনিসকে পবিত্র ও ও পূজনীয় বলে মনে করতো। ইনকাদের ভাষায় এদের বলা হতো 'হুয়াকা'। পাহাড়, ঝরনা, পাথরের স্তূপ, বড় বড় মন্দির সব কিছুকেই হুয়াকা রূপে গণ্য করা হতো।

ইনকারা 'ভিরাকোচা' নামে এক সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো। তাঁর আকৃতি ছিলো মানুষের মতই। মন্দিরে মন্দিরে তাঁর প্রতি-মূর্তি রাখা হতো। ভিরাকোচার উপাসনা প্রধানত উচচশ্রেণীর মানুষদের মধ্যেই সীমিত ছিলো বলে পণ্ডিতরা ধারণা করেন। ইনকাদের মধ্যে একটা কাহিনী প্রচলিত ছিলো যে ভিরাকোচা নানা অঞ্চলে ঘুরে ফিরে লোকের মধ্যে ধর্ম প্রচার করার পর ইকয়েডর-এর উপকূল থেকে যাত্রা করে প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউ-এর উপর দিয়ে হেঁটে পশ্চিমদিকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। তাই পিজারো যখন পেরুর পশ্চিম উপকূলে এসে ওঠেন তখন ইনকারা ভেবেছিল যে ভিরাকোচা আবার ফিরে এসেছেন।

ইনকাদের সমাজে পুরোহিত শ্রেণীও ধাপে ধাপে বিন্যস্ত ছিলো। সর্বোচচ স্থানে ছিলেন মহাপুরোহিত। তাঁকে বলা হতো 'ভিলাক উমু'।

তিনি রাজধানী কুজ্‌কোতেই থাকতেন। সাধারণত রাজার কোনো ভাই বা চাচাই মহাপুরোহিত হতেন। তাঁর নীচে যে সমস্ত উচচপদস্থ পুরো-হিত থাকতেন তাঁরাও সম্রাটের আত্মীয়স্বজন থেকেই নির্বাচিত হতেন। সবচেয়ে নীচের স্তরের পুরোহিতদের অবশ্য সাধারণ মানুষের মধ্য থেকেও নেয়া হতো।

ইনকাদের রাজ্যে সব শহরেই সূর্যদেবের মন্দির ছিলো। এ সব মন্দিরের ভিতরে অবশ্য পূজা হতো না। পূজা-উৎসব হত মন্দিরের বাইরের চত্বরে। শুধু পুরোহিতরাই মন্দিরে প্রবেশ করতো। মন্দির থেকে পূজার উপকরণ বের করে এনে খোলা চত্বরে পূজা অনুষ্ঠান করা হতো। ইনকা রাজ্যের সবচেয়ে বড় সূর্য-মন্দির ছিল কুচকো শহরে। সব মন্দিরেই অনেকগুলো দালান থাকতো। তাতে পুরোহিত মন্দিরের কর্মচারীরা থাকতো। মন্দির সংলগ্ন একটা আলাদা বাড়িতে সন্ন্যাসিনী বা পবিত্র মহিলারা থাকতেন। এখানে দু'শ্রেণীর মহিলা থাকতেন। এক শ্রেণীর মহিলাদের বলা হত 'সূর্য কুমারী' বা 'মানাকুনা'। এঁরা ছিলেন চিরকুমারী সন্ন্যাসিনী। আরেক শ্রেণীর মহিলাদের বলা হতো নির্বাচিত 'মহিলা' বা 'আকলাকুনা', এঁদেরকে সম্রাট বা অভিজাত শ্রেণীর মানুষ দ্বিতীয় পত্নী হিসেবে গ্রহণ করতেন।

ইনকা রাজ্যে নরবলির তেমন প্রচলন ছিলো না। তবে বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে নরবলি দেয়া হতো। প্রত্যেক দিন সকালে সূর্য উঠলে ভাল ভাল খাদ্য সূর্যের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে আগুনে ফেলে দেয়া হতো। পরে বেলা হলে একটা লাল রঙের লামাকে সূর্যের উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হতো।

কুজকোর মন্দিরের সামনের বিশাল চত্বরে বছরের নানা সময়ে বড় বড় ধর্মীয় উৎসবও অনুষ্ঠান হতো। প্রতি মাসে কুজকোতে অন্তত একটা বড় রকমের বার্ষিক অনুষ্ঠান হতোই। এ সকল অনুষ্ঠানের

অনেকগুলোই শস্য রোপন, ফসল কাটা প্রভৃতি ঘটনার সাথে যুক্ত থাকতো। এ সকল অনুষ্ঠানে ও উৎসবে লামা বলি দেওয়া হতো, নাচ, গান, মদ পান এবং খাওয়া দাওয়াও হতো। কোনো কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপবাস পালন করা হতো।

ইনকারা দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতো। ইনকা ধর্মে খ্রীষ্টধর্মের মতো পাপ স্বীকার বা কনফেশনের রেওয়াজ ছিলো। পাপ স্বীকারের পর পুরোহিতদের দেওয়া শাস্তি ভোগ করতে হতো। তারপর নদীতে স্নান করে পাপ ধুয়ে ফেলা হতো। খ্রীষ্টধর্মের সাথে এ সকল প্রথার মিল দেখে স্পেনীয় পাদ্রীরা খুবই অবাক হয়েছিলেন।

ইনকা সংস্কৃতির পরিচয়

জ্ঞান বিজ্ঞান, শিকল্পলা, হস্তশিল্প

ইনকাদের সভ্যতার একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, শাসন ব্যবস্থা, কারিগরিবিদ্যা প্রভৃতিতে উৎকর্ষের পরিচয় থাকলেও, তাদের সভ্যতা সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার বিকাশের মাত্রার মধ্যে সামঞ্জস্য ছিলো না। যেমন এত বিশাল ও সুসংগঠিত ইনকা সাম্রাজ্যে লেখন পদ্ধতির প্রচলন ছিলো না। ইনকারা কোনোভাবেই লিখতে পারতো না, চিত্রলিপি দিয়েও না। তবে ইনকারা 'কিপু' নামে এক ধরনের সুতার গোছা দিয়ে কথা ও সংখ্যার হিসেব রাখতে পারতো।

একটা লম্বা সূতাকে টানটান করে ধরা হতো। তার থেকে সারিসারি সূতা ঝুলিয়ে দেয়া হতো। এ ঝুলন্ত সুতাগুলো নানা রকম রঙের হতো। এ ঝুলন্ত সুতাগুলোতে একটু নীচে নীচে গিঁট বাঁধা থাকতো। এ সুতার গোছাকে বলা হতো কিপু। এক এক রঙের সূতা এক একটা সংখ্যা বোঝাতো, আবার গিঁটগুলোর অবস্থান দেখেও সংখ্যা বোঝা যেতো। এসব কিপু দিয়ে সাম্রাজ্যের কোথায় কত ফসল আছে, কোথায় কি সম্পদ আছে তার হিসেব রাখা হতো। আবার এক ধরনের কিপু কথা মনে রাখার জন্যও ব্যবহৃত হতো। যেমন, একটা খবর মুখে বলে কিপু তৈরি করে বুঝিয়ে দেয়া হলো। সংবাদ

বাহক কিপু নিয়ে অনেক দূরে কোনো রাজকর্মচারীর কাছে চলে গেলেন। সেখানে কিপু দেখে দেখে কথাগুলো মনে করে বললেন। বিশাল ইনকা সাম্রাজ্য এভাবে কিপুর উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হতো। মিশর ব্যাবিলনের যে কোনো সাম্রাজ্যে এ রকম ব্যবস্থা অকল্পনীয় ছিলো।

ইনকাদের জোতির্বিদ্যা বিষয়ক জ্ঞান মায়া, আজটেক বা ব্যাবিলনীয়, মিশরীয়দের তুলনায় ছিল নগণ্য। ইনকারা বছরের দৈর্ঘ্য ঠিকমত মাপতে পারতো কিনা সন্দেহ।

ওজন ও পরিমাপের ক্ষেত্রেও ইনকারা খুব বেশি উন্নতির পরিচয় দিতে পারে নি। ইনকারা দৈর্ঘ্য (দূরত্ব) এবং ক্ষেত্রফল মাপার জন্য একটা শব্দই ব্যবহার করতো – টোপো। ১ টোপো ছিল ৪½ মাইল লম্বা। আর ১ টোপো পরিমাণ জমি ছিলো প্রায় তিন বিঘার সমান। পণ্ডিতদের মতে, ইনকাদের নাকি ওজন মাপার কোনো বাটখারা বা একক ছিলো না; তরল পদার্থ মাপার কোনো এককও নাকি তাদের ছিলো না। তবে ঝুড়ি ভর্তি করে শস্য মাপার একটা পদ্ধতির প্রচলন ছিলো বলে জানা যায়।

ইনকাদের সমাজে গীত ও বাদ্যের চর্চা হতো। তাদের বাদ্যযন্ত্র ছিলো বাঁশি ও ঢোলক জাতীয়। ইনকাদের বাদ্যযন্ত্র তৈরি হতো কাঠ, নলখাগড়া, হাড়, শামুকের খোল, ও ধাতু দিয়ে। ইনকা রাজ্যে বা প্রাচীন আমেরিকা মহাদেশের কোনোস্থানেই তাদের বাদ্যযন্ত্র ছিলোই না বলা চলে। ইনকাদের দেশে যে সব বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিলো তা হলো : ঢোলক, বাঁশী, ঘণ্টা, ট্রাম্পেট্। আমাদের বাঁশের বাঁশির মতো ফুটোওয়ালা বাঁশিও তাদের ছিলো। ইনকাদের দেশে প্যান্ পাইপ নামে এক ধরনের বাদ্য যন্ত্র ছিলো। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, প্রাচীন চীনের অনুরূপ এক বাদ্যযন্ত্রের সাথে এর ঘনিষ্ঠ মিল ছিলো।

ইনকাদের সাহিত্য খুব উঁচু মানের ছিলো। ইনকাদের সমাজে লেখার প্রচলন ছিলো না। তাই এ সাহিত্য শুধু মুখে মুখে প্রচলিত ও প্রচারিত হতো। মনে রাখার সুবিধার জন্য এ সাহিত্যকে ছন্দোবদ্ধ কবিতার আকারে প্রকাশ করা হতো। এ ভাবে ইতিহাস ও পৌরাণিক উপাখ্যান কবিতা ও লোকগাথার আকারে সংরক্ষিত হয়েছিলো। এ ছাড়া ছিলো ধর্মীয় প্রার্থনা ও সঙ্গীত এবং লোকায়ত কবিতা ও গান।

ইনকারা দালান কোঠা তৈরি করতো পাথর দিয়ে। বিশেষত কুজকো, মাচচুপিচচু ও অন্যান্য শহরে রাজপ্রসাদ, মন্দির, দুর্গ প্রভৃতি তৈরি করা হতো পাথর দিয়ে। পাথরের টুকরো সাজিয়ে দেওয়াল তোলা হতো। পাথরের ফাঁকগুলো ভরে দেয়া হতো মসৃণ মাটি দিয়ে। পাথরগুলো সুন্দরভাবে খাঁজে খাঁজে বসিয়ে এমন সুদৃঢ় দেওয়াল তৈরি করা হতো যে সব প্রাসাদ বা দুর্গ বহু শত বছরেও এতটুকু দুর্বল হতো না। এ সকল দালান কোঠার দেওয়াল পাথরের তৈরি হলেও, তাদের ছাদ তৈরি হতো ঘাস প্রভৃতির আচ্ছাদন দিয়ে। তবে ইনকা রাজত্বের শেষদিকে টিটিকাকা হ্রদ অঞ্চলে ও উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে পাথরের টুকরো দিয়ে ছাদ তৈরির কৌশল প্রবর্তিত হয়েছিলো। অবশ্য, কুজকো অঞ্চলে এরকম নির্মাণ কৌশল কখনও প্রচলিত হয় নি।

পেরুর দালানগুলো সাধারণত একতালা বাড়ি হতো, তবে দোতালা এবং তিনতালা বাড়িও সেখানে ছিলো। তবে এ ইনকা আমলের আগে থেকেই উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে এ রকম দোতলা বা তিনতালা দালানের প্রচলন ছিলো।

ইনকা আমলের মন্দিরগুলো মেক্সিকো অঞ্চলের মতো ধাপ পিরা-মিডের উপর নির্মিত হতো না। তবে উত্তর অঞ্চলে ইনকাদের আগের আমলে কয়েকটি পিরামিড-মন্দির তৈরি হয়েছিলো। উত্তর অঞ্চলের

উপকূলে অবশ্য ইনকা আমলের অনেককাল আগে কাঁচা ইঁটের পিরামিড তৈরি হয়েছিলো। বর্তমান ট্রুজিলো শহরের কাছে মোচে নামক স্থানে ইনকাদের আগে অনেক পিরামিড নির্মিত হয়েছিলো। এ পিরামিডগুলোর মাথায় মন্দির তৈরি হতো। এ সকল পিরামিড বেশির ভাগই ছিলো উপকূল অঞ্চলে।

ইনকারা পিরামিড বানাতো না তবে তারা বড় বড় প্রাসাদ, মন্দির প্রভৃতি তৈরি করতো। ইনকারা প্রধানত পাথরের বাড়ি তৈরি করতো।

ইনকাদের সভ্যতায় পাথরের ভাস্কর্য একেবারে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত ছিলো। ইনকাদের প্রাসাদ, দূর্গ প্রভৃতি স্থাপত্যকর্মে অলঙ্করণের চিহ্নও বিশেষ পাওয়া যায় না। ইনকাদের শিল্পকর্মের প্রকাশ ঘটেছে মাটির পাত্রে, সুতী ও পশমী কাপড় ও ধাতুর তৈরি জিনিসপত্রে। ইনকারা উৎকৃষ্ট মানের ও সুন্দর রঙীন নক্সা আঁকা সুতা ও পশমের কাপড় তৈরি করতো।

ইনকারা মাটির পাত্র তৈরি করে তার গায়ে নানা রকম রঙীন নক্সা ও ছবি আঁকত। ইনকারা কুমারের চাক ব্যবহার করতে জানত না। তারা খালি হাতে মাটির পাত্র বানাত। একটা কৌশল ছিলো বেতের ধামা তৈরির পদ্ধতিতে মাটির পাত্র তৈরি করা। প্রথমে মাটিগুলে তাকে লম্বা দড়ির আকার দেয়া হতো। তারপর তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এক পরতের উপর আরেক পরত করে সাজানো হতো, যেমন করে বেতের ধামা তৈরি করা হয়। পরে হাত দিয়ে ঘষে ঘষে পাত্রের ভিতর ও বাইরের দিককে সমান করে লেপে দেয়া হতো। ধাতুর কাজে ইনকারা মায়া বা আজটেকদের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। ইনকারা সোনা, রূপা, তামার গয়না ও জিনিসপত্র তৈরি করতো। ইনকারা তামার সাথে

টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জও তৈরি করতো। উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রাচীন মিশর ও ব্যাবিলনে ব্রোঞ্জের প্রচলন ছিলো। ইনকারা ধাতু গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে সোনা, রূপা, তামা ও ব্রোঞ্জের জিনিসপত্র ও গয়না তৈরি করতো। তারা 'সিরে পার্ডু' বা 'মোম লুপ্তি' পদ্ধতিতে ছাঁচে ঢালাই করতো। প্রথমে মোম দিয়ে একটা গয়না বা মূর্তি তৈরি করা হতো। সেটাকে মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হতো। মাটিটা শুকিয়ে গেলে তাকে আগুনে গরম করা হতো। মাটিটা গরম হলে ভিতরের মোম গলে যেতো এবং একটা ফুটো দিয়ে মোমটা বেরিয়ে আসতো। তখন মাটির ভিতরটা ফাঁপা হয়ে গেল। এখন সোনা, রুপা বা তামা গলিয়ে ফুটো দিয়ে ঐ মাটির ভিতরে ঢুকিয়ে দিলে এ গলিত ধাতু আগেকার মোমের মূর্তি বা গয়নার আকৃতি পাবে। এ পদ্ধতিকে বলা হয় 'মোম লুপ্তি' পদ্ধতি। এ পদ্ধতি মেক্সিকোর আজটেকরাও ব্যবহার করতো। এ পদ্ধতি প্রাচীন মিশরে প্রচলিত ছিলো। এ পদ্ধতিতে ধাতুর জিনিস ঢালাই করার পদ্ধতি আমেরিকা মহাদেশে স্বতন্ত্রভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিলো না কোনো-ভাবে তারা এ বিদ্যা মিশর বা এশিয়া থেকে পেয়েছিলো সে বিষয়ে পণ্ডিতরা একমত হতে পারেন নি।

গ্রন্থপঞ্জি

মায়া ও আজটেক সভ্যতা-বিষয়ক

১. Michael D. Coe : The Maya (১৯৬৬)

২. ,, Mexico (১৯৬২)

৩. J. Eric S. Thompson : The Rise and Fall of the Maya Civilization (২য় সংস্করণ, ১৯৬৬)

৪. ,, Maxico Before Cortez, (১৯৪০)

৫. S. G. Morley : The Ancient Maya (১৯৪৬)

৬. G. C. Vaillant : Aztecs of Mexico (১৯৪৪ ; সংশোধিত সংস্করণ, ১৯৬৫)

৭. Encyclopaedia Britannica (১৫তম সংস্করণ)-এর ১১তম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত নিম্নোক্ত প্রবন্ধ : "Meso American Civilization, History of" (পৃ. ৯৩৪)

ইনকা সভ্যতা-বিষয়ক

৮. J. Alden Mason : The Ancient Civilizations of Peru

৯. Encyclopaedia Britannica (১৫তম সংস্করণ)-এর ১ম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত নিম্নোক্ত প্রবন্ধ : "Andean Civilization, History of" (পৃ: ৮৩৯)

. . . . . . এ গ্রন্থমালার বই সবার জন্যে। . . . . . .

প্রাচীন আমেরিকায় গড়ে উঠেছিলো বিচিত্র সভ্যতা। আজ তার চিহ্ন নেই, কিন্তু তার উত্তরাধিকার পৃথিবী বয়ে চলেছে। বিলুপ্ত সে-সভ্যতার পরিচয় তুলে ধরবে এ বই।